চুলকাটা

– মফিজ ইমাম মিলন

যে বয়সে ভোমরা আর প্রজাপতির পার্থক্য বুঝতে শিখিনি। গুণগুনিয়ে গান কিংবা কবিতা পড়াও শুরু হয়নি। অনুভূতি জন্মায়নি নারী–পুরুষ ভেদাভেদ বিচারের। যখন একেবারেই বিশ্বস্ত ছিলাম পাড়ার আপাদের কাছে। ফুপু, ছোটখালা পাশের বাসার রানীআপা পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা হাতে ধরিয়ে দিয়ে গোসলখানায় অনেক পানি খরচ শেষে একটা একটা চেয়ে নিয়ে কাপড় বদলাতেন। আমি বিশ্বস্ত বালকের ভূমিকা পালন করতাম। অন্য কিছু চিন্তা–ভাবনা মাথায় আসতো না। এখন যেমন মুহূর্তেই ভেবে নিতে পারি তারা কিভাবে কি পরতেন। বয়সের তুলনায় মুখখানা বেশি ইনোসেন্ট থাকায় মেয়ে মহলে বেশ কদর ছিল এখন বুঝতে পারি।

১৯৬৬ সাল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস সিক্স–এর ছাত্র। গেন্ডারিয়ার সাত্তার হাজির বাসার ভাড়াটের ছেলে হিসেবে এলাকায় পরিচিতি। আব্বা চাকরি করতেন। কিন্তু চাকরিজীবী ছেলে না বলে ভাড়াটের ছেলে বলতেন প্রায় সকলেই। সে সময়ে ভাড়া থাকা একটু তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার ছিল। অফিসার, বড় কর্মকর্তারা আজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতেন তাদের আলাদা মর্যাদায়। আমরা ভাড়াটে। ফলে ঢাকার আদিবাসীরা *ভাড়াটের পোলা* বলতো। আশপাশের অনেকেই উর্দুতে কথা বলতো। ঢাকাইয়্যারা এমন তেরিয়া–মেরিয়া ভাষায় উর্দু বলতো যার উত্তর দেয়া ছিল নোয়াখালি হুজুরের বয়ান আর সওয়াল–জবাব দেয়ার মতো সাধ্যাতীত। এসব থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করতাম কবে ঈদ আসবে, ঈদে গ্রামের বাড়ি যাবো, প্রাণ খুলে গ্রামে থাকা চাচাতো ভাইবোনদের সঙ্গে কথা বলবো।

বাপ মা ছাড়া গ্রামে না গিয়ে শহরে ঈদ করা ছিল আমাদের পরিবারে একেবারে নাজায়েজ। আমার প্রয়াত আব্বা তার আব্বাজানকে *বাপজান* সম্বোধন করে এক মাস আগে থেকেই ডাক বিভাগের বদৌলতে যোগাযোগ করতেন। অমুকদিন অমুক সময় যেন নৌকা থাকে। আমরা গেন্ডারিয়া থেকে পোস্তগোলা, তারপর নারায়ণগঞ্জ স্টিমার, পরের দিন গোয়ালন্দ, দর্শনা ডাউনে চেপে সন্ধ্যায় কালুখালী জং আবার হাটা, শুধু হাটা নয়, বড় ভাইয়ের মাথায় হোল্ডঅল স্টিমার ডেকের ময়লা এবং রেলের ইন্টার ক্লাসের ছারপোকাসহ হাটা। আরজু, আমার দশ মাসের বড় বোন, নতুন জুতায় পায়ে ফোসকা এবং মায়ের চুল ঝাকুনিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। ছোট দুই ভাইয়ের কান্নার কোনো স্কোপ নেই। কারণ তারা আব্বা অথবা মা দুজন দুজনের কোলে। এরপর দুই ঘণ্টা জার্নি বাই বোট, খাল–বিল পার হয়ে সেই *বিশ্বেস বাড়ি*। মা অন্তত দুইশবার উচ্চারণ করতেন গ্রামে মানুষ আসে!

আবার আব্বা সেসব তোয়াক্কা করতেন না। বাপজানের কাছে গিয়ে ঈদ করবেন এই তৌফিক দিও এটাই ছিল তার সারা রমজান মাসের মোনাজাতের একটি অন্যতম অংশ।

আমাদের গ্রামের বাড়ি ঠিকানা লিখতে হতো এভাবে – নাম :... প্রযত্নে :... গ্রাম : পাকশীয়া, পাকা মসজিদওয়ালা বিশ্বেস বাড়ি, ডাকঘর : হাটগ্রাম খাগজানা, ভায়া : রতনদীয়া, থানা : পাংশা, মহকুমা : রাজবাড়ী, জেলা : ফরিদপুর।

কয়েক বছর পর ঈদে আব্বা আমাদের ছয় ভাইবোন নিয়ে দাদাবাড়ি গেলেন আর তিন ভাই তখনো পৃথিবীতে আসেনি। থাকলে নিশ্চয়ই তাদের রেখে যেতেন না। আম্মা যতো রাগারাগীই করুন, আনন্দে ঈদ করবো দাদাবাড়ি। কিন্তু সব আনন্দ মলিন হয়ে গেল পরদিন সুধীর শীল যখন ক্ষুর–কাচি হাতে দাদাবাড়ি এসে হাক ছাড়লেন কর্তার খবর পেয়ে। সুন্নতি চুল ছাটার আদেশ হলো। ঢাকা থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসায় চুল কাটা হয়নি আমাদের। কিন্তু আম্মা রূপা দিয়ে চুলের কাটা তিনটে করে ঝুলন বানিয়ে এনেছেন ঠিকই। বড় ভাই দিলীপকুমার কাটিং, আমি পাকিস্তানের উঠতি নায়ক ওয়াহিদ মুরাদ কাট, মেজটা নাদিম ঢঙয়ে – এমন করে চুল কাটাতাম ঢাকায়। সেই চুল তখন সুন্নতি কায়দা নেবে! কান্নাকাটি শুরু হলো। মেজ দাদাজান কিছুতেই

এসব বেয়াদবি মেনে নেবেন না। তিনি নিজে জজ। আজিমপুর গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে থাকেন। সুন্নতি চুল রেখেছেন। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে *ফকির জজ* বলেন। আমরা তার নাতি হয়ে দিলীপ, ওয়াহিদ মুরাদ হবো তা হয় না। মুসলমানের এক কথা, সুধীর শীলের কালো দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুজে বাটিছাটা নয়, সুন্নত ছাটা হতেই হবে।

সুধীর বুঝতে পেরেছে আমরা শহুরে টেডিপরা ছেলে, তার হাতে চুলছাটা আমাদের সম্মানের ব্যাপার। কারণ ঢাকায় ফিরে গিয়ে আবার সেই জুম্মাখানের সেলুনে যেতে হবে। সুধীর গল্প করলো। *মুনি–রে তোমরা আমার আতে চুল ছাটাতি চাচ্ছো না, কিন্তু আমি কতো বড় বড় মানুষির চুল–বাল কাটিছি তা জানো, ইছুপ হোসেন চৌধুরী, আরজাদ ডাকতার তারা সকলে এমএনএ ছিল, সেই চুলকাটা নিয়ে তারা পরচিম পাকিসতান ঘুরে এলো।*

সুধীরের লোমশ দুই থোড়া দিয়ে মাথা ঢেকে ধরে সুন্নত ছাট দিচ্ছে এমন সময় ছোট দাদা বলে উঠলেন, *সুধীর, তুমি এতো কামাবার পারো তা তোমার বাপ ক্যান উব্বা–জুব্বা নিয়ে মরলো!*

সুধীরের গল্প বন্ধ হলো। ততোক্ষণ আমার মাথার শাদা চামড়া বের করে ছেড়েছে। বাড়ির ভেতর ছুটে গেলাম। আয়নায় নিজের চুলের অবস্থা দেখে কান্না থামাতে পারলাম না। সহানুভূতির ডালা হাতে এগিয়ে এলো চাচাতো বোন। *কাদিস না,* বলে কাছে টেনে নিল, আরো কাছে, এবং আরো কাছে। হঠাৎ করেই আরো বেশি কাছে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে পেয়ে বসলো আমার। অপ্রত্যাশিত পাওয়া। কোন পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। ওর বুকের ভেতর কি যেন খুজছি, অথচ কাদছি। দাদি এসে ওর কাছ থেকে আলাদা করে দিলেন। কিন্তু আমি দাদির আদর চাই না। আমি যে আরো কাদবো তা দাদিকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। আমার সেই চাচাতো বোনটি বুঝতে পেরেছিল, আমি আরো কাদতে চাই। সে নিজেও কান্নার অংশীদার হতে চেয়েছিল। দাদি তা হতে দেননি।

ঈদুল ফিতরের আড়াই মাস পরেই ঈদুল আযহা। আড়াই মাস কয়েক বছরের মতো সময় লাগলো পার হতে। আব্বার সঙ্গে বাড়ি গেলাম। যাবার আগে সবাই টেডিচুলের বাহারি ডিজাইন করালো। কিন্তু ইচ্ছে করেই চুল ছাটলাম না আমি। সুধীরের হাতেই চুল ছাটাবো। যথারীতি সুধীরের দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুজে দিলাম। সুধীর গল্প শুরু করলো। *মুনী, তোমরা তো রাজধানীতে থাকো, অনেক কিছু জানো, আমাদের দেশের দুর্নীতি দমন মন্ত্রী কে তা কি জানো?*

বিস্মিত হলাম সুধীরের প্রশ্ন শুনে। গণ্ডগ্রামের নাপিত বলে কি! আচ্ছা, ঢাকায় বড় একটা সিনেমা হল *বলাকা* কিডা বানায়ছে তা কি শোনেছো। সুধীর চুল ছাটে কোন সেলুনে, কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে, তা না বলে এসব কথা কেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

ঈদ আসে ঈদ যায়। ছেলেবেলায় আরো কাদতে চেয়েছিলাম যার সঙ্গে সে কান্না বুকের মধ্যে জমাট বেধে আছে। সুধীরের সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। সুধীর নেই। দেশ ছেড়েছে। কাকে জানাবো বলাকা হল কে বানিয়েছে আর কে ছিল দুর্নীতি দমন মন্ত্রী? সুধীর, আবার যদি সেই সহজ সরল দিনগুলো আসতো, বিশ্বস্ত বালক হতে পারতাম তাহলে সেই ঈদে চুলকাটার কান্না আনন্দ হয়ে ফিরতো।

ফরিদপুর থেকে

নিরাপদ অন্ধকার

– আলী আহমেদ রুশদী

Ignorance is bliss, অজ্ঞতা একটি পরম সুখ। কথাটা কোথায় এবং কার কাছে প্রথম শুনেছেন আবেদ সাহেব তা কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তিন দিন হয় আবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এক মাসের মধ্যেই দুবার আসতে হলো। গত মাসের শেষের দিকে আবেদ সাহেবের হার্ট বাইপাস হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণীর হার্ট সার্জন জেকব গোল্ডস্টাইন–এর তত্ত্বাবধানে প্রায় সাত ঘণ্টাব্যাপী এই অপারেশনে আবেদ ধরতে গেলে আবার নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। সর্বমোট পাচটা বাইপাস করা হয়েছে তার মনে পড়তেই আরেকবার শিহরিত হন তিনি। মনে মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন সদা অগ্রগামী বিজ্ঞানের কাছে।

এই সময়টাতে হাসপাতাল বড় নিঝুম লাগে। কেউ আসে না কারো কাছে, নার্সরাও চলাফেরা করে পা টিপে টিপে। দুপুর প্রায় শেষ হতে চললো। ঘুমানোর কথা এখন। কিন্তু ঘুম আসে না। কতো যে চিন্তা ভিড় করে মাথার ভেতরে! একা লাগে খুব।

এরা সমস্ত পর্দা টেনে দিয়ে রাত ডেকে এনেছে ঘরের ভেতর। বাইরে গিয়ে বসলে হয়। আজ আর একা বের হতে সাহস পেলেন না। পরশু রাতের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তখন ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীরা ঘুমে অচেতন। আবেদ আলতো পায়ে টয়লেটে গিয়েছিলেন। যদিও বিছানার সঙ্গেই লম্বা ইলেকট্রিক তারে কলিংবেল দেয়া আছে, বেল টিপলেই নার্সদের কেউ হাজির হতো, এমনকি বিছানার ওপরই শুয়ে কিংবা বসে বাথরুম করার ব্যবস্থা আছে তবুও এসব ভালো লাগে না তার। নিজের সমস্ত গোপনীয়তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে ভাবতেই কেমন অস্বস্তিতে মন ভরে যায়। তাই বাথরুমে যেতে যেতে হাপিয়ে ওঠা সত্ত্বেও তিনি পরম শান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলেন।

যাহোক, এ কাজটা অন্তত নিজে থেকেই সারা যাবে। কিন্তু কমোড থেকে দাড়াতে না দাড়াতেই চোখে অন্ধকার নেমে আসে। দুলতে শুরু করে চারপাশের পৃথিবী, মনে হয় ভীষণ ঝড়ের ভেতর দাড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্য চোখে ভাসে মায়ের মুখ। তিনি জ্ঞান হারান।

দরজা খোলাই ছিল বাথরুমের। কর্তব্যরত নার্স ফ্লোরা দৌড়ে এসে আবেদের মাথা কোলে নিয়ে সযত্নে শুইয়ে দেয়। অন্যান্য নার্সরা ততোক্ষণে ওয়ার্ডের ডাক্তার টমসন–কে ডেকে আনে। চোখে পানি ছেটানোর পর আবেদ যখন চোখ খোলেন তখন তিনি বিছানার ওপরে, গায়ে নতুন এপ্রোন এবং চাদর। নার্সরা তার সমস্ত শরীর পরিষ্কার করে মুছে দিয়েছে তিনি বুঝতে পারেন। কিছু বলার আগেই অবসন্নতা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। ঘুম নেমে আসে।

তাই আজ বেল টিপে ডাকলেন নার্সকে। বললেন, সিসটার, যদি কিছু মনে না করো, আমাকে কি একটু বাইরের বারান্দায় নিয়ে বসিয়ে দেবে?

হাসি মুখে মেয়েটা বললো, অবশ্যই!

উঠে দাড়াতে গিয়ে আবার বুকের ব্যথাটা টের পান তিনি।সেলাইটা এখনো শুকাচ্ছে না। ঠোট চেপে ব্যাথাটাকে দমন করার চেষ্টা করেন। একবারের জন্য মনে হয় ঘর থেকে করিডোরের দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে পারবে না কিছুতেই। কিন্তু ওই এক মুহূর্তেই শুধু মনের জোরে উঠে দাড়ালেন তিনি। এ রকম সারা জীবন ধরে চলতে হয়েছে বহুবার। নার্সের কাধে হাত রেখে ক্লান্ত ধীর পদক্ষেপ ফেলেন তিনি। মাঝে মধ্যে টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করেন নার্সের সঙ্গে। কিন্তু এদের সঙ্গে কোনো কথাই জমে না তেমন। কি বললেন তা ভেবে পান না। শুধু মনে হয়, শব্দেরও গভীরে প্রত্যেক ভাষারই আছে নিজস্ব কোনো সত্তা। অন্য এক সংস্কৃতির মানুষ হয়ে সেই সত্তার উন্মোচন সম্ভব হয় না অনেক সময়েই। তাই কোনো কোনো দেশ সব সময়েই পরদেশ থেকে যায়।

করিডোরের অন্যপ্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছেন মি. জ্যাকসন। তাকে দুদিক থেকে ধরে আছে দুজন নার্স। জ্যাকসন–কে কখনোই মনমরা দেখা যায় না। এ রকম মনে হয় যেন হাসপাতাল এক বিরাট বড় পিকনিক স্পট। এবং যেন হার্ট সার্জারির মতো মজার অভিজ্ঞতা আর হতেই পারে না। তার সার্জারি শেষ হয়েছে মাত্র তিন দিন। এর মধ্যেই দিব্যি হেসে–খেলে বেড়াচ্ছেন। আবেদকে বললেন, রেডি হয়ে নাও, তুমি এবং আমি আজ করিডোরের এ মাথা থেকে ওই মাথা রেস দেবো।

তার কথা ভাবে হেসে ফেললেন আবেদ। মনের আকাশের ঘন কালো মেঘ একটু হয়তো হালকা হয়ে এলো। সত্যিই কতো অল্পেই মানুষ আনন্দিত হয়।

ছায়া ঢাকা সুন্দর একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিয়ে নার্স বিদায় নিল। জায়গাটা সুন্দর, চারপাশে ছোট ছোট টবে বিভিন্ন ধরনের মরসুমি ফুল। গভীরভাবে শ্বাস টানলেন তিনি। একবার ভাবলেন, সঙ্গে নিয়ে আসা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *মানবজমিন* পড়বেন। কিন্তু বই খুলেও মন লাগাতে পাললেন না। চারপাশে এতো ভিড়, তবু যে কি জনহীন পৃথিবী!

আজকাল বাম হাতটার দিকে খুব নিবিষ্টভাবে চেয়ে দেখেন আবেদ। হাতটির কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত প্রায় দশ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা মোটা দুটি শিরা কেটে নিয়ে সেলাই করে দেয়া হয়েছে। সেলাই শুকানো শুরু হয়েছে। গোল্ডস্টাইন বলেছেন, খুব শিগগিরই ঘা শুকিয়ে যাবে। আরো বলেছেন যে, হার্টের সেলাইতে কোনো ইনফেকশন আছে বলেও মনে হয় না। তবু ভয় কাটে না আবেদের। বারে বারে বুকের সেলাইটা জানান দেয়, সে আছে। একদিন সেলাই শুকাবে। অনেক দিন পরে সেলাইয়ের দাগেরও চিহ্ন থাকবে না। তবু সে আছে, তবু সে ছিল...আবেদ সারা জীবনই জানবেন।

কতো রকম ভয় যে এসে ঘিরে ধরে তাকে! ওয়ার্ডের ডাক্তার টমসন বলেছেন, তার রক্তে শ্বেতকণিকা সাংঘাতিকভাবে কমে এসেছে। ফলে যে কোনো ধরনের ইনফেকশন সম্ভব। সবচেয়ে ভয়ের কারণ হচ্ছে, শ্বেতকণিকার পরিমাণ ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে।

গতকাল সকালে আবেদের বিছানার চারপাশের পর্দাগুলো টেনে দিয়ে ড. টমসন বললেন, প্রায় চব্বিশ রকমের বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার পরও আমরা অন্ধকারে। তোমার শারীরিক অবনতির কোনো কারণই আমরা খুজে পাচ্ছি না।

আবেদ নীরব থাকেন।

ডাক্তার আবার বলেন, আমরা তোমার রক্তে এইডস (AIDS)-এর জীবাণু আছে কি না দেখতে চাই।

অস্ট্রেলিয়ার আইন অনুসারে এ পরীক্ষাটি করার আগে রোগীর অনুমতির প্রয়োজন। আবেদ তা জানে না। ডাক্তারের সঙ্গে সহযোগিতা করার সার্বিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আবেদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, এইডস! আমার কেন এইডস হবে?

ডাক্তার টমসন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন উপায়েই এইডস সংক্রমিত হতে পারে। যেমন ব্লাড ট্রান্সমিশন, যৌন সঙ্গম, সিরিঞ্জ শেয়ার করলে...।

আর শুনতে চান না আবেদ। শুধু বিতৃষ্ণা আর অজানা এক রাগে মুখ ফিরিয়ে বলেন, কখনো না, আমি কখনোই এইডস আক্রান্ত হতে পারি না। আমার শরীরে কখনোই অন্য কারো রক্ত সঞ্চালিত হয়নি। আমি কখনোই...কথা শেষ করতে পারেন না।

আহা! Calm Down... I am just talking about possibilities. শান্ত হন... আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। এই ধরো তোমার স্ত্রী কিংবা তোমার পার্টনারের যদি জীবাণু থাকে।

অসম্ভব! আমি গত ত্রিশ বছর যাবৎ বিবাহিত এবং আমি আমার স্ত্রীকে ছাড়া...তুমি তা জানো?

আহা, উত্তেজিত হচ্ছো কেন? তোমার স্ত্রীরও তো কোনো বন্ধু থাকতে পারে, পারে না?

ডাক্তার টমসন! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি আমাদের সমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! You are hurting me, you know that –এসব কথা বলে আপনি আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। তা কি আপনি জানেন?

ডাক্তার আর কথা বাড়ান না, আবেদও না। তিনি নিঃশব্দে একটা ছাপানো ফরমে অনুমতি সূচক দরখাস্ত দিয়ে দেন।

এরপর ডাক্তার টম–এর সঙ্গে আরো দুবার দেখা হয়েছে। আবেদ প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছেন যে হার্ট বাইপাস–এর সময় তার শরীরে কোনো ব্লাড ট্রান্সমিশনের প্রয়োজন হয়নি। জেনে আবেদ প্রথম খুশিই হয়েছিলেন। কারণ রক্তের মাধ্যমে এইডস–এর জীবাণু সংক্রমিত হতে পারতো। তবু যদি রক্ত পরীক্ষা করার পর জীবাণু ধরা পরে? তাহলে কি...। আবেদ আর ভাবতে পারেন না। শরীরটা ঘিন ঘিন করে ওঠে, মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করে, লক্ষ ঝি ঝি পোকা ডেকে ওঠে। চেষ্টা করেন মানবজমিন–এ ডুবে যেতে।

সত্যি কি অদ্ভুত শক্তিশালী এই লেখক! কতো সহজে বলে দেন মানুষের গভীর গোপন একান্ত আন্তরিক সব অনুভূতির কথা যেন কোনো এক জীবনে তিনি ছিলেন সবার আত্মার আত্মীয়। আজ সব চরিত্র ছাড়িয়ে *প্রীতম*–এর চরিত্র বড় টানছে আবেদ সাহেবকে। তিনি আবছা কোনো মিল খুজে পান কি প্রীতমের সঙ্গে?

সাধারণ একজন নরম মনের মানুষ প্রীতম। কতো রকম স্বপ্ন, কতো পরিকল্পনা, কতো কিছু করার ইচ্ছা, শুধু ওই ইচ্ছা পর্যন্ত এসেই থমকে ছিল তার। তারও ছিল আর পাচজনের মতো সহজ, স্বাভাবিক জীবন, স্ত্রী, কন্যা নিয়ে সুখের সংসার। এর মধ্যেই সে ছিল সম্পূর্ণ। কিন্তু একদিন নাম না জানা অসুস্থতার রূপ নিয়ে এলো ছন্দপতন। কি এক অসুখে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল সে। ধীরে ধীরে কর্মশক্তি রহিত হলো, হাটাচলা বন্ধ হলো, চাকরি ছাড়তে হলো। তবুও প্রচণ্ড বাচার ইচ্ছে, ভালোবাসার মানুষদের কাছে পাবার বাসনা তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে লক্ষ্য করলো, তার অতি ভালোবাসার মানুষ তার স্ত্রী বিলু শুধু কর্তব্যর খাতিরেই তার দেখাশোনা করছে, মনের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে সে। তার আছে এখন নতুন মনের মানুষ, নতুন বন্ধু, স্বপ্নের ভাগীদার। তার অতি আদরের কন্যা যার মুখ দেখে তার রাত ভোর হতো সে দূরের হলো হঠাৎ। তাই একদিন এক ঘটনাবিহীন সকালে সে সরে গেল সবার থেকে দূরে, চোখের আড়ালে।

পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তিনি যদি সত্যিই এইডস আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে সুষমা তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে? কথাটা মনে আসতেই শরীরে ঘিনঘিনে ভাবটা যেন উধাও হয়ে গেল। আরো গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন আবেদ। সুষমা কি করুণা করবে তাকে? শুধুই কর্তব্য করে যাবে বিলুর মতো? আচ্ছা! সুষমা কি কখনো বিলুর মতো হবে? বিলুরা তো শীর্ষেন্দুর উপন্যাসের পার্শ্বনায়িকা এবং বিংশ শতাব্দীর। আর সুষমা? তাকে তো কোনো শতাব্দীতেই সঞ্চায়িত করা যাবে না। সুষমার বাইরে আবেদ। এবং তার বাইরে সুষমার কি কোনো অস্তিত্ব আছে?

এইডস একটি ব্যাধি। আরেকটি উপসর্গ মৃত্যুর। মৃত্যু আমাদের সর্বশেষ গন্তব্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো প্রগতির ক্ষমতা নেই তাকে অস্বীকার করে। আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়ে যায় মৃত্যুর ইতিহাস।

নিজের মনেই হেসে উঠলেন আবেদ। বড্ড আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছেন কি তিনি? আবার ভাবেন, এই বয়সে আবেগ ছাড়া আছেই বা কি তার? তার তিন সন্তান স্নিগ্ধা, অদ্বিতীয়া আর রিমা এখনো বাবার গলা জড়িয়ে চুমু খায়। দুই হাত দিয়ে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে ধরে রাখে আবেদকে প্রতিবার হাসপাতালে যাবার আগে। তবু কি তারা এক সময় সংসারী হবে না? নিজেদের সন্তান, পরিবার ও সমাজ? কতোদিন বাবার গলা জড়িয়ে থাকতে পারবে ওরা?

আবেদও কি পেরেছেন তার বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে? বাবার মৃত্যুর সময় তবু কাছে ছিলেন তিনি। মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগেও বাবার চোখে–মুখে বাচার যে আকুল আগ্রহ দেখতে পেরেছিলেন তা ভেবে মনটা এখনো কুকড়ে ওঠে। তখন তিনি ঢাকায়। বাবার একটা বিশ্বাস ছিল ঢাকার কোনো হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনি ভালো হয়ে যাবেন। নিয়তি তা হতে দেয়নি। মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি অস্ট্রেলিয়ায়। দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন মা। একবার দেশে গিয়ে দেখেও এসেছিলেন। কিন্তু কতোদিন তিনি থাকতে পেরেছেন সুষমা ও সন্তানদের ছেড়ে?

আবেদের ভাবনা আর শেষ হয় না। তিনি কি সত্যিই সুষমাদের জন্য অসুস্থ মাকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন? নাকি চাকরি, অর্থ, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ তার কাছে অপরিহার্য ছিল? মাকে কি তিনি অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসতে পারতেন না চিকিৎসার জন্য? বাবা ও বড় ভাই তখন নেই। মাকে তিনি কার কাছে রেখে এসেছিলেন? বড় ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা তো তখনো নিজের পায়ে দাড়াতে পারেনি। দাদির চিকিৎসার ভার তারা কি বইবে? আবেদ অবশ্য চেয়েছিলেন মা তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া আসুক। কিন্তু মা আসেননি। মা মনে করেছেন, তিনি চলে এলে আবেদ তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের খোজ নেবেন না।

কথাটা অনেকাংশে সত্যি। মায়ের মৃত্যুর পরে আবেদ দেশে গিয়ে মায়ের চিকিৎসা, সৎকার ও খরচ বাবদ প্রায় লাখ টাকার দেনা শোধ করে এসেছেন। তারপর গ্রামের বাড়ির জন্যে তিনি সময় কিংবা অর্থ কিছুই তেমন দিতে পারেননি। এভাবেই একদিন নাসিমাবাদ গ্রামের আবেদ তার অতি প্রিয় শৈশব জড়িত আম, সুপারি, নারকেল বাগান ও বাশঝাড়ের মায়া কাটিয়ে শহরবাসী হয়ে ওঠেন।

গতবার যখন তিনি সেমিনার উপলক্ষে ঢাকা গিয়েছিলেন নাসিমাবাদ গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক ঢাকায় এসে তাকে ধরেছিলেন নাসিমাবাদ গ্রামের মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় সভাপতিত্ব করার জন্য। আবেদ দশ হাজার টাকার একটা চেক তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, আমার ছোট মেয়ে অসুস্থ, আমাকে কালকেই অস্ট্রেলিয়া ফিরে যেতে হবে। বস্তুত ফ্লাইট না পাওয়ার অজুহাতে তিনি আরো পাচদিন ঢাকায় ছিলেন।

আবেদের ভাবনায় আবার ছেদ পড়ে। স্নিগ্ধা, অদ্বিতীয়া ও রিমার যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন তিনি কিভাবে সময় কাটাবেন? রিমার কথা ভাবতেই তার চোখ ভিজে আসে। তিনি যখন পিএইচডি করার জন্য বিদেশ আসেন তখন রিমার বয়স চার বছর। সেই চার বছরের কন্যাটিকে রবীন্দ্রনাথের *যেতে নাহি দেব* শোনাতে গিয়ে বাবা-মেয়ে কেদে বুক ভাসিয়েছিলেন। সেই মেয়ে কতো বড় হয়েছে! মোনাশ ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্রীদের অন্যতমা। বাবাকে ছেড়ে রিমা তার নিজের ঘর সাজানোর জন্য চলে যাবে ভাবতেই আবেদের চোখ ভিজে যায়। তবু যেতে দিতে হয়, এটা এই সংসারের নিয়ম। একদিন রিমার ছোট দুটি হাত আবেদকে ধরে রাখতে পারেনি। আজ আবেদের রুগ্ন হাত তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

আবেদ তার বাম হাতটির দিকে আবার তাকান। ডাক্তার টমসন তাকে বলেছেন, এইডস আক্রান্ত হলেও কেউ কেউ পচিশ বছর বেচে যান। তাহলে আর ভাবনা কি? বিশ পচিশ বছর পর তো তিনি এইডস ছাড়াও চলে যেতে পারেন। হ্যা পারেন, তবু জানতে ইচ্ছা হয়, এইডস-এর ভাইরাস তার মধ্যে কি করে এলো? এই নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আরো আলাপ হয়েছে।

ডাক্তার বলেছেন, Blood transmission and sexual intercourse are two main sources only. There may be lots of other sources. রক্ত সঞ্চালন ও যৌন সঙ্গম দুটি প্রধান কারণ মাত্র। অন্য কারণেও এইডস হতে পারে।

আবেদ ভাবেন, কি দরকার জেনে? কিভাবে তিনি আক্রান্ত হলেন কিংবা আদৌ হয়েছেন কি না? থাকুক না সব যেমন আছে।

বিকেল গড়িয়ে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক, কখন চায়ের কাপ সরিয়ে নিয়েছে নার্সরা, কখন রাতের খাবার দিয়ে গেছে কিছুই জানেন না তিনি। হঠাৎ কাধের ওপর সুষমার হাত টের পান।

সুষমা বলে, চলো, ঘরে চলো।

কাধের ওপর দিয়ে সুষমার হাত দুটি বুকের ওপর নিয়ে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন তিনি। বলেন, না, অন্ধকার আমার বড় প্রিয়।

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া থেকে

ঈদের শুভেচ্ছা

– কাজী রোকসানা

এক ঈদের দুই দিন আগে আমার ইমিডিয়েট বড় ভাইয়া এসে আমায় বলেন, তোর ঈদ কার্ডগুলো আমায় দিবি?

বললাম কেন, এগুলো তো আমাকে সবাই গিফট করেছে, তা তোমাকে কেন দেবো?

তারপর বললেন, জানিস, একটা ঘটনা হয়ে গেছে। অফিসে বসে আছি। আমার এক কলিগের ছোট মেয়ে কতোগুলো ঈদ কার্ড কিনে এনেছে তার বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাবে বলে। কিন্তু কার্ডে কি লিখে শুভেচ্ছা জানাবে সেটা আমার কাছে জানতে চাইলো। আমি তো এসব তেমন কিছু পারি না। ফোন করলাম বড় ভাগ্নের কাছে। জানতে চাইলাম, আচ্ছা, ঈদ কার্ডে শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমরা বন্ধুর কাছে কি লেখো।

বললো, মামা, আমি অতো কিছু জানি না। শুধু লিখি, *ঈদের শুভেচ্ছায় বন্ধুকে বন্ধু,* এই সব।

তারপর আবার ফোন করলাম আরেক ভাগ্নের কাছে। ঈদ কার্ডে বন্ধুকে তোমরা ছন্দ, কবিতা লিখে শুভেচ্ছা জানাও না।

হ্যা, শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু অতো কবিতা, ছন্দ–টন্দ বুঝি না। এগুলো সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জানা নেই।

আমি বললাম, আচ্ছা এই কাহিনী! এতো খুব সহজ কথা। আমার কাছে বললেই হতো। আসলে এই শুভেচ্ছার তেমন কোনো বাণী আমারও জানা ছিল না। ভাইয়া বলার পর সঙ্গে সঙ্গে লিখতে বসলাম। অনেকগুলো লিখে ফেললাম। যেমন

- রমজানের ত্রিশটি রোজা রেখে নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে যাও।
- ঈদের দিনে পৃথিবীর বুকে মানুষের বেশে নবরূপে এসে শান্তির বন্যা বইয়ে দাও।
- ঈদের আনন্দ হাজার বছর ধরে তোমার মাঝে আসে যেন বারে বারে।
- পৃথিবীর সব সুখ, আনন্দ পাবে তুমি ঈদের দিনে এ প্রত্যাশাই রইলো সর্বদা আমার মনে।
- মনমরা হয়ে থেকো না ঈদের দিনে। হাসি–আনন্দে কাটিও সেদিন মনে, প্রাণে।
- ঈদের আনন্দ তোমার মাঝে ফিরে আসুক বার বার এই কামনায় ঈদের শুভেচ্ছায় আমি সদা তৎপর।
- ঈদের আনন্দ হোক প্রতিদিনের আনন্দ। দূর হোক নিত্যদিনের সকল নিরানন্দ।
- ঈদ যেন তোমাকে সারাক্ষণ সুখে রাখে। ঈদের মাঝে যেন কোনো ব্যথা নাহি থাকে।
- শুধু একটি দিনের জন্য ঈদ আসে তোমার–আমার সবার মাঝে। নবরূপে মহাখুশির নব–সাজে, ধনী–গরিব সবাই ঈদকে ভালোবাসে।
- তুমি থেকো মহান ঈদের আনন্দের অবকাশে। প্রতি বছর ঈদ আসে মহাখুশির মহাউল্লাসে, একই কাতারে নামাজে দাড়ায় ধনী–গরিবের পাশে, ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়ে ঈদ সবার মাঝে আসে।
- ঈদের প্রভাতের পবিত্র আনন্দের মতো হোক তোমার প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণ।
- ঈদের দিনের মতো হোক তোমার জীবনের প্রতিটি দিন।
- ঈদ তোমার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল শান্তির বন্যা। এটাই আমার শুভ কামনা।
- ঈদ বয়ে আনুক অনাবিল সুখ আর অম্লান হাসি। এই প্রতীক্ষায় মোরা বার বার ঈদের মাঝে ফিরে আসি।
- তোমার হাসি, আমার হাসি হোক না এবার ঈদের খুশি।
- ঈদ হোক চিরস্থায়ী আনন্দের, বেদনা হোক ক্ষণস্থায়ী অতীতের।
- তোমাকে জানাবো ঈদের শুভেচ্ছা এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছা।
- অতীতের দুঃখ–গ্লানি ভুলে গিয়ে ঈদের আনন্দের মাঝে ফিরে এসো। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানুষকে নতুন

করে ভালোবাসো।

● ঈদের দিনে নতুন বেশে, নতুন রূপে এসে মিষ্টি মুখ করবে প্রথম মোদের বাড়ি বসে।

রুইয়া, বরিশাল থেকে

বেদনা

– নজরুল ইসলাম

ঈদ মানে বেদনা।

আপনারা হয়তো ভাবছেন কি এমন বেদনা ঈদের মধ্যে। হ্যা, ঈদ আমরা যারা প্রবাসী তাদের জন্য বেদনা। সবার জীবনে ঈদ বয়ে আনে খুশি। কিন্তু প্রবাসীদের জন্যে বয়ে আনে বুক ভরা বেদনা।

রমজানের দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর সবার জন্য আসে খুশির ঈদ। ঈদকে ঘিরে প্রবাসীর বেদনা হলো যে, *ঈদ* শব্দটা মনে হলে মনের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। আর আমরা যারা প্রবাসে আছি তাদের ঈদের খুশির আড়ালে বুকের মধ্যে জমে আছে বেদনা ভরা যতো দুঃখ। আমরা এখানে অনেকে ঈদের দিন কাজও করে থাকি। ঈদ আসার আগে আমরা সবাই ব্যস্ত থাকি বাড়িতে মা–বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়স্বজন সবার জন্য ঈদের কাপড় কেনার টাকা দেয়ার জন্য। আবার অনেকে এখানে সারা বছর কষ্ট করে থাকলেও যদি হাতে কোনো টাকা–পয়সা জমা না থাকলে যে কোনো প্রকারে অন্য কারো কাছ থেকে ঋণ করে হলেও টাকা পাঠিয়ে দেন।

আমরা সব সময় চিন্তা করি দেশের কথা। দেশে ফেলে আসা অতীতকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমাদের ঈদের আনন্দ কেটে যায়। দেশে থাকা কালে ঈদ আসার আগে কতো আয়োজন করে থাকি। বন্ধু–বান্ধবকে ঈদ কার্ড দেয়া, ঈদের জামা–কাপড় কেনা, ঘর সাজানো ইত্যাদি।

ঈদের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে ভালো সাবান দিয়ে গোসল করে নতুন জমা–কাপড় পরে দলে দলে ঈদগাহ মাঠে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া। নামাজ পড়ে বাড়ি এসে মা–বাবাকে সালাম করে বেরিয়ে পড়তে হয় আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে। আবার অনেকে চলে যাই কোথাও অনেক দূরে বেড়াতে, কোনো পার্কে বা সমুদ্র সৈকতে, কেউবা চলে যাই প্রেমিক–প্রেমিকার সঙ্গে অজানা কোনো অচিনপুরিতে। এভাবে একেকজনে একেকভাবে ঈদের আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

ঈদের দিনে নেই কোনো মা–বাবার বাধা–নিষেধ। যে যার মতো ঈদের খুশিতে, যার যার ইচ্ছে অনুযায়ী নতুন ভাবে, নতুন সাজে। কেউবা ঘরে হরক রকমের ঈদ স্পেশাল খাবার জিনিস বানিয়ে থাকেন। চার দিকে আনন্দ আর আনন্দ। দুই চোখ তাকিয়ে দেখলে শুধু দেখা যাবে খুশি এবং খুশি। ছোট থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত দেখা যায় নতুন জামা–কাপড়, পাঞ্জাবি–পায়জামা ইত্যাদি গায়ে দিয়ে, বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চারা নানান রকমের ডিজাইনের কাপড় পরে হেটে হেটে বেড়ায়। তাদের হাতে থাকে নানান রকমের খেলনার জিনিস। সব কিছু মিলিয়ে ঈদের দিনটা থাকে বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিনের তুলনায় অন্য রকম।

তার বিপরীতে এই প্রবাসে ঈদের সময় নেই কোনো নতুন কাপড়, নেই কোনো আনন্দ উল্লাস। কেউ কেউ নামাজটা পড়ে রুমে এসে শুয়ে থাকে। কিন্তু শুয়ে থাকলে যে, ঘুম আসে না! শুয়ে শুয়ে দেশের কথা চিন্তা করতে থাকে। আমরা এখানে পড়ে আছি আর ওইদিকে দেশে সবাই কতো আনন্দ করছে। একমাত্র টাকার কারণে আমরা আজ এই ঈদের খুশি উপভোগ করতে পারছি না।

অন্যদিকে আবার কেউ কেউ টেলিভিশন সামনে নিয়ে বসে এবং বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখে। আমরা যারা প্রবাসী তারা সেদিনই মানে যেদিন মা–বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন সবাইকে ছেড়ে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে টাকা উপার্জনের জন্য শত মায়া, মমতা উপেক্ষা করে বিদেশ পাড়ি জমাই এবং তখনই আমাদের সব কিছুর

সমাপ্তি ঘটে। থাকে না কোনো আনন্দ-সুখ-শান্তি, থাকে শুধু একটাই চিন্তা। এবং সেই চিন্তা হলো কিভাবে মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাবো।

এই আমরা যে কতো কষ্ট করে প্রবাসে টাকা রোজগার করি তা একমাত্র বিধাতা জানে। দুনিয়াতে অসহায় বলতে গেলে আমরা প্রবাসীরাই। আমাদের এখানে আছে শুধু কাজ এবং কাজ। তারপর আমাদের জন্য ঈদ আসুক আর যাই আসুক, সবই সমান। এ প্রবাসে আমাদের জন্য ঈদ বলতে কিছুই নেই। নেই আনন্দ, আছে শুধু প্রিয়জনের জন্য খা খা করা একটা হৃদয়। যেমন মরুর প্রান্তে বালিগুলো খা খা করে একফোটা পানির জন্য ঠিক তেমনি আমাদের হৃদয়ও খা খা করে ঈদের দিন এক নজর প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু ভাগ্যের কারণে আজ আমাদের সব কিছু থেকেও কিছু নেই।

সবদিক মিলিয়ে ঈদ মানে বেদনা। তবুও হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আমাদের প্রবাসীর পক্ষ থেকে দেশের মানুষের প্রতি ও দেশের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি রইলো ঈদ মোবারক। ঈদ যেন আমাদের মতো কারো জীবনে বেদনা বয়ে না আনে। ঈদ বয়ে আনুক খুশির জোয়ার।

আল-খোবার, সউদি আরব থেকে

বারোটি বছর

– মোহাম্মদ জাকির হোসেন খান

শেষ ঈদ যে ঈদের দিনে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদিকে নিয়ে আনন্দ করেছিলাম। ১৯৯১ সালের কথা। এইচএসসি পাস করেছিলাম ১৯৯১ সালে। আশানুরূপ ফলাফল না করায় ভবিষ্যৎ জীবন হতাশা আর বেকারত্ব ছাড়া কিছু ছিল না।

দেশে যেখানে হাজার হাজার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বেকার সেখানে আমার মতো বেশি হলে মাস্টার্স পাস ছেলের ভাগ্যে বেকারত্ব ছাড়া কিছুই মিলবে না। তাই কল্পনার রাজ্যে ভাবতাম যদি কোনোভাবে বিদেশ যেতে পারতাম তাহলে সৎ পথে উপার্জিত অর্থে কোনো রকমে বেচে থাকার বাবার সংসারে নিজের যে দায়িত্বটুকু আছে তা পালন করতে পারবো।

স্বপ্ন একদিন বাস্তব হলো। আমার এক মামা সউদি আরবে থাকেন। তার এক ছোট ভাইয়ের জন্য ভিসা পাঠান। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ছোট মামার বিদেশ আসা হয়নি। সেই ভিসা নিয়ে আমি সউদি পাড়ি দিই পেট্রোডলারের আশা নিয়ে।

ফ্লাইট আগস্ট মাসের ১৩ তারিখ বুধবার। প্রিয়জন বাবা-মা, ভাই-বোনদের ছেড়ে চলে আসি। সে সময়ে জীবিত ছিলেন আমার দাদি। আমার দাদি আমাকে অনেক আদর-যত্ন করতেন। বিদায়বেলায় দাদির চোখের পানি দেখে বুঝতে বাকি নেই যে, আমি সম্পূর্ণ এক নতুন জীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছি। বুকের ভেতর এক অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি হলো। মনে হলো, এটাই দাদির সঙ্গে আমার জীবনের শেষ দেখা।

দাদি দোয়া করে বলেছিলেন, তোর প্রতি আমার দোয়া আছে। জীবনে কষ্ট পেলেও ভেঙে পড়বি না।

আজ দাদি নেই। দাদি আছেন আমার স্বপ্নে, আমার স্মরণে। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানায়। কর্মময় জীবন যে কাজ দিয়ে শুরু তা হলো, সউদি ছাত্রদের হস্টেলে তিনবেলা খাওয়ানো। খাওয়ানোর পর ময়লা পরিষ্কার করা, ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা। এরই নাম সংগ্রাম।

জীবন সংগ্রামে কখনো এতো কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হবো ভাবতেও পারিনি। কিন্তু এও জানি পেছনে ফেরার উপায় নেই। হস্টেলে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন বাংলাদেশি ছিলাম। তাদের নিয়েই সউদিতে হস্টেলে প্রথম ঈদের দিন। কিন্তু একি দেখছি! ঈদের দিন কারো চোখে আনন্দ, মুখে হাসি নেই। বরং অনেককে কাদতে দেখেছি। নিজেও বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদির কথা স্মরণ করে কেদেছি।

কিছুদিন হোস্টেলে কাজ করার পর বেতন কম, তাই চাকরি ছেড়ে শহরে চলে আসি। হস্টেল ছিল শহর থেকে দূরে মরুভূমিতে। চাকরি ছেড়ে চলে আসার পর দীর্ঘ সময় বেকার ছিলাম। ভাগ্যক্রমে চাকরি হলো। তবে শহরে নয়, শহর থেকে অনেক দূরে। যেখানে চারদিকে মরুভূমি আর মরুভূমি। মাঝে মধ্যে নতুন বাড়ি হচ্ছে। আমার চাকরি হলো মরুভূমিতে নির্মাণাধীন বাড়িতে সকাল-বিকেল পানি দেয়া আর দেখা। আমাকে থাকতে দেয়া হলো বাড়ির একটা রুমে। একা, বড় একা, দিন কোনোভাবে কেটে গেলেও রাত কাটতো বহু কষ্টে, ভয় ও আতংকের মাঝে।

সউদি মরুভূমিতে কিছু কুকুর আছে। এরা দিনে মরুভূমিতে মানুষের চোখের আড়ালে চলে যায়। রাত নির্জন হলে দল বেধে খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। কোনো খাদ্য পেয়ে গেলে ভাগাভাগি করতে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতো। তখন হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যেতো। আর ঘুম হতো না। এ অবস্থায় কেটে গেল সউদি আরবের দ্বিতীয় ঈদ।

একবার ভেবেছিলাম চলে আসি। কিন্তু যেখানে অসংখ্য মানুষ বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছে অথবা নেশাগ্রস্ত সেখানে আমার ভাগ্যে ভালো কিছু আশা করতে পারিনি। তাই আর ফেরা হলো না। শুরু হলো আরো সংগ্রাম এবং সংগ্রাম।

অবশেষে দুঃখ, হতাশা কিছুটা হলেও কমেছিল। নতুন চাকরি পেলাম সেলসম্যান হিসেবে কাপড়ের দোকানে। ভাগ্য ধরা দিল। আস্তে আস্তে লোকজন, আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে পরিচয় বা যোগাযোগ হলো। বিভিন্ন সময়ে বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করলাম। কিন্তু ঈদ এলে সবার মতো আমার নিজের আনন্দটুকুও হারিয়ে যেতো। মনে হতো এতো মানুষের মাঝে আমার শূন্যতা ও রক্তের বাধনের কেউ নেই।

অনেক পথ পাড়ি দিয়ে আজ বড় না হলেও আমি ছোট একজন ব্যবসায়ী। পরম করুণাময় বিধাতার অশেষ কৃপা আর বাবা-মা, ভাই-বোন-এর দোয়ায় প্রায় পাচ বছর পর দেশে এসেছিলাম। তারপর দ্বিতীয়বার দেড় বছর পর। এসে বিয়ে করেছি। জীবন থেকে বারোটি বছর প্রবাসে চব্বিশটি ঈদ আনন্দহীন কেটে গেল। দেশে এসে ঈদ করা হলো না।

আমরা যারা প্রবাসে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারি না, ঠিক তেমনি আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন এবং যাদের স্ত্রী আছে দেশে তারাও আমাদের স্মরণ করে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না। অনেকের স্ত্রী আছে, বাবা-মা অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ির অনুরোধ সত্ত্বেও নতুন কাপড় পরেন না। ঈদ মানে আনন্দ হলেও স্বামী ছাড়া স্ত্রী, স্ত্রী ছাড়া স্বামী ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না। বরং আনন্দটাই আরো বেশি করে মানসিক দুঃখ বা কষ্ট দিয়ে যায়। তাই বহু প্রত্যাশিত আগামী ঈদ, ঈদুল আজহা সবাইকে নিয়ে করবো এই আশা রাখি। বাকি উপরওয়ালার ইচ্ছা।

রিয়াদ, সউদি আরব থেকে

বোকা

– মোহাম্মদ সোহেল রানা

২০০২ সালে ঈদুল ফিতরের আগের দিন দাদুবাড়িতে খালাতো, মামাতো ভাইবোন সবাই সমবেত হয়েছিল ঈদের পূর্ণ তাৎপর্য রক্ষার জন্য। ঈদ মানে খুশি, আনন্দ। এক মাস রোজা রাখার আনন্দকে আরো প্রাণবন্ত করার জন্য এক মাস আগেই আমরা ঠিক করেছি, সবাই মিলে দাদুবাড়িতে ঈদ করবো।

ঈদের আগের রাত। সবাই খাটের ওপর বসে গল্প শুরু করি। বলে রাখি সবার মধ্যে আমি বোকা। খুব বোকা ঠিক নয়, খানিকটা হাবাগোবা, যে যা বলে তা-ই শুনি। মাস দুয়েক আগে আমার এই দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে নাজিম আর হাফিজ আমাকে অনেক পামপট্টি মেরে ফুলিয়ে খালাতো বোন কান্তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়ার জন্য তাগাদা দেয়। আমি ফুটবলের মতো ফুলে গিয়ে কান্তাকে গড় গড় করে বলে ফেলি, পৃথিবীর আদিম মিষ্টি বাক্য, *আই লাভ ইউ।*

জানি না বোমা বিস্ফোরণ ঘটতে কতো সময় লাগে তবে আমার গালে ঠাস শব্দ হতে একটুও দেরি হলো না। হতবাক হয়ে দাড়িয়ে কান্তার ফিরে যাবার পথ পানে চেয়ে থাকি।

আজ রাতের আসরে সেই কান্তা আমাকে আবারও বোকা বানানোর জন্য প্রস্তাব দিল, সোহেল, তুমি যদি আমার থেকে ভালো কবিতা লিখতো পারো তবে তোমার সঙ্গে প্রেম করবো।

বললাম, যদি হেরে যাই তাহলে...!

কান্তা বললো, সবার সামনে আমাদের কুকুর জেভিকে তোমার কিস দিতে হবে।

কিন্তু বিষয় কি হবে?

আসিফ বললো, বাংলাদেশের প্রধান চার দলের দলপতিদের সম্বন্ধে লিখতে হবে। সময় নির্ধারণ করা হলো বিশ মিনিট।

সময় শেষ হলো। আমার কবিতা পর্যায়ক্রমে এবং কান্তা আসিফ, নাজিম, হাফিজ ও বেবি পড়ে বণ্টিত নাম্বার যোগ করে দেখা গেল আমি জিতেছি।

শর্ত অনুযায়ী কান্তা এখন আমার প্রেমিকা। কিন্তু কান্তার মুখ লজ্জায় লাল হয়েছে, সঙ্গে নাজিমেরও। কান্তা–নাজিম জুটি ভালোবাসার জুটি। আমি খুশিতে আত্মহারা যেন যুদ্ধে জয়ী সেনাপতি। ঠিক হলো ঈদের দিন থেকে আমাদের শর্ত পূরণ হবে।

কান্তা ভাবতেও পারেনি আমি তার থেকে ভালো কবিতা লিখবো। কান্তা বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখতো। হয়তো এ জন্য তার অহংকার আকাশ ছুয়েছিল। আমি এটাও বুঝতাম, আমার দারিদ্র্য আর অস্বাভাবিক দৈহিক গঠনের জন্য যে কোনো নারী আমার কাছে ভিড়তে চায় না। তাই বলে মানুষের দুর্বলতাকে নিয়ে কারো কি উপহাস করা মানায়!

খাওয়া শেষে সবাই ঘুমাতে গেলাম। জানি না কে কেমন ঘুমিয়েছে। তবে আমি ঈদের আনন্দ আর কান্তাকে পাওয়ার আনন্দে সারা রাত বেশ ঘুমিয়েছি। খুব ভোরে উঠে কান্তাকে জেগে তুলে ঈদ মোবারক জানালাম।

কিন্তু কান্তা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না।

বললাম, কান্তা, কালকের প্রতিযোগিতার উপহার আমি নেবো না। সেটা তো একটি খেলা ছিল।

কান্তা এতোটাই অবাক ও আনন্দিত হলো যে, আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললো, You are great, Now we are best friend. ইউ আর গ্রেট। নাও ওই আর বেস্ট ফ্রেন্ড।

তারপর পিছনে ফিরে দেখি আমাদের দিকে সবার দৃষ্টি ঠিক যেন ওরা সবাই বোকা। এভাবেই আমি ঈদের আনন্দকে সবার মাঝে বিলিয়ে দিলাম।

শিবপুর, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর

বন্ধু চাচা

– শহীদুল্লাহ–বিন–সালেহ

আমি, আমার চাচাতো ভাই ও আমার এক চাচার জন্ম একই বছরে। সে অর্থে আমরা সমবয়সী এবং ভালো বন্ধুও বটে। আমরা বড় হয়েছি, দিনগুলো পার করেছি এক সঙ্গে। স্কুলেও যেতাম এক সঙ্গে।

খালের পাড় দিয়ে গায়ের আকা–বাকা পথ ধরে ছোট–বড় মিলিয়ে দুটি খালের ওপর দুটি বাশের নড়বরে সাকো পেরিয়ে আমরা তিনজনে একত্রে বিদ্যা অর্জন করতে যেতাম গোলপাতার ছাউনি দেয়া একটি স্কুলে। ক্লাসে বসে আকাশ দেখা যেতো। বৃষ্টি হলে টপ টপ পানি পড়তো বইয়ের ওপর আর আমরা চিৎকার করতাম। তখন আজকালকার মতো ব্যাগের বালাই ছিল না। অনেকগুলো বই বগলদাবা করে খালি পায়ে স্কুলে যেতাম। বৃষ্টির দিনে মেঠো পথ কাদা হয়ে যেতো। তখন লুঙ্গিটাকে মালকোছা দিয়ে সে কাদা মাড়িয়ে স্কুলে যেতে হতো। স্কুল ছুটি হলে পথে কতো যে দুষ্টামি করেছি তার ইয়ত্তা নেই। এ গাছের ফল, ও গাছের

ফল, কারো বাড়ির পেয়ারা, আম, জাম্বুরা থাকতো না আমাদের জন্য। এ জন্য স্যারদের কাছে অনেক নালিশও যেতো, শাস্তিও পেয়েছি অনেক।

এভাবে আমরা হেসে খেলে কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পণ করলাম। তখনই ঘটলো এক বিপত্তি। আমার বন্ধু মানে, আমার চাচা পাশের বাড়ির পরমা সুন্দরী লাকির প্রেমে পড়ে গেল। লাকির তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু লাকিকে আমার চাচার জন্য চাই চাই-ই। তিনজনে বুদ্ধি করে একদিন চলে গেলাম ফহিরের কাছে। যে ব্যক্তি ঝাড়-ফুক, তাবিজ-কবজ দেয় তাকে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় ফহির বলে।

ফহির সব কিছু জেনেশুনে মেয়ের মাথার চুল, একট নব্যহাসের ডিম, আধাপোয়া সরিষা ও তিনটি মাদুলি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেতে বললো। ফহির আমাদের সময় বেধে দিল। তার মধ্যে যেতে হবে।

আমরা সব কিছু ম্যানেজ করলেও চুল ম্যানেজ করবো কিভাবে? অবশেষে লাকির এক স্কুল বান্ধবীর মাধ্যমে চুলও ম্যানেজ করলাম। বিনিময় তাকে দিতে হলো একটি স্নো ও আইব্রোসহ একটি মাথার ব্যান্ড। সব কিছুর ব্যবস্থা করে আমরা ফহিরের কাছে উপস্থিত। ফহির তার দর্শনি নিয়ে লাল কালি দিয়ে একটি তাবিজ লিখে তার ভেতর চুলটিকে মুড়িয়ে মাদুলিতে ঢোকালো। তাছাড়া আরো তিনটি মাদুলিতে আরো তিনটি তাবিজ দিল, সঙ্গে ডিম ও সরিষা পড়া। এগুলো তার নির্দেশ মতো প্রয়োগ করলেই লাকিকে আমার চাচা অবশ্যই পাবে।

আমরা মহাখুশিতে চলে এলাম। এখন ফহিরের নির্দেশ মতো কাজগুলো সমাপ্ত করার পালা। চুল ভরা তাবিজটিকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে একটি গাছের মগডালে যাতে তাবিজটি বাতাসে দোল খায়। তাবিজটি বাতাসে দোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাকির হৃদয়ে আমার চাচার জন্য দোল খাবে। আর ডিমটি পুতে রাখতে হবে মাটির চুলোর পাশে। কারণ রান্না করার সময় ডিমটি গরম হতে থাকবে আর লাকির মন আমার চাচার জন্য ছটফট করতে থাকবে। বাকি তিনটি তাবিজ পুতে রাখতে হবে ঘরের সামনে ও পেছনের দরজায় আরেকটি পুতে রাখতে হবে বাথরুমের সামনে। এবং সরিষাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখতে হবে ঘরের চারপাশে। মোট কথা, লাকি প্রতি কদমে কদমে আমার চাচাকে স্মরণ করবে এবং এক সময় আমার চাচার কাছে ছুটে আসবে।

ফহিরের নির্দেশ মতো খুব সতর্কতার সঙ্গে নির্বিঘ্নে কাজগুলো সম্পাদন করলাম। এবার চাচাকে ছাড়া লাকি যাবে আর কোথায়। চাচাও একটু খোশ মেজাজে আছেন। কিন্তু চাচার খোশ মেজাজ বেশি দিন টিকলো না। এতো তাবিজ-কবজের পরও লাকির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। চাচাও একটু ঘরছাড়া জীবন যাপন শুরু করলো। ফলে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। তারপর চাচাও অন্যত্র বিয়ে করেছে। এবং আমি চলে গেলাম উচ্চ শিক্ষা নেয়ার জন্য ঢাকায়।

শুক্রবাদ, ঢাকা থেকে

হাসনাপু

– সাজনা বেগম

হাসনা আমার আপু। বড় আপু। তাকে হাসনাপু বলে ডাকি। আমার এই জীবনে এখন পর্যন্ত হাসনাপুর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখিনি। আমার আপুকে প্রথম দেখলে যে কেউ খুব বড় ধরনের একটা ধাক্কা খায়। এতো সুন্দরী মেয়ে বাসা-বাড়িতে থাকে না, সিনেমা নাটকে থাকে। হাসনাপু হাসলে তার গালে টোল পড়ে।

আমি ছোটবেলা মনে মনে প্রার্থনা করতাম, যেভাবেই হোক হাসনাপুর রূপের কিছুটা যেন আমি পাই। আমার গায়ের রঙ ফর্শা নয়, কালোও নয়। এ দেশের বেশির ভাগ মেয়েদের গায়ের রঙ শ্যামলা।

আমি হাসনাপুকে গিয়ে বললাম, আপু, একশটা টাকা দেবে?

কিসের জন্য? বলে সিনেমার নায়িকাদের মতো হাসলো। তবে সিনেমার নায়িকাদের মতো কৃত্রিম হাসি না। প্রকৃত সুন্দর হাসি যে হাসি দেখে সাত খুন মাফ করা যায়। আপু জিজ্ঞাসা করলো, টাকা দিয়ে কি করবি?

নতুন একজন লেখকের বই এসেছে। তার লেখা পত্রিকায় পেয়েছি। সে বই কিনবো।

ও আচ্ছা।

দেবে?

একটু পর আপু আমাকে চকচকে পাচটা কুড়ি টাকার নোট এনে দিল। রুমে গিয়ে মুখে কিছু মেকআপ করে বেরিয়ে পড়লাম। লাইব্রেরিতে যাবো। রিকশা করে *কিবরিয়া বুক হাউস*–এ পৌছালাম। লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। সালেহভাই নেই, বাবর আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছেন আপা?

ভালো। তুমি কেমন আছো? আমি বললাম।

আপনার দোয়ায় ভালো আছি।

হেসে বললাম, আমি কিন্তু তোমার জন্য কোনোদিনও দোয়া করিনি। দোয়া করতে হয় না। দোয়া মন থেকে হয়ে যায়।

বাবর গ্রামের ছেলে। রায়শ্রী গ্রাম। সে প্রথম যখন এ লাইব্রেরিতে এসেছিল তখন একেবারে গ্রামীণ ছিল। কথা বলতো গ্রামীণ টানে। তারপর পরিবর্তন হতে লাগলো। দ্রুত পরিবর্তন। কথাবার্তা শুদ্ধ করে বলে, এরপরও মাঝে মধ্যে গ্রামীণ টান এসে যায়। যখন বুঝতে পারে গ্রামীণ টান এসে গেছে তখন সে বেশি কথা বলে না।

আমি বললাম, জালাল নামে একজন লেখকের বই বের হয়েছে, উপন্যাসের নাম *শ্যাওলা ঘাটের মেয়ে*। বইটি আছে?

আছে। দেবো? বাবর জিজ্ঞাসা করলো।

হ্যা দাও।

সে বইটি দিল।

টাকা দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে যাবো তখন চোখ পড়লো লাইব্রেরির সামনে পান সিগারেটের দোকানের দিকে। দুটি ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে অসভ্যতার ছোয়া। আমি তাড়াতাড়ি করে রিকশায় উঠলাম। রিকশা চলতে লাগলো। পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম ওই দুই ছেলে আমাকে ফলো করছে। এ রকম অনেকবারই হয়েছে। কোনো মোড়ে বা কলেজ থেকে যাবার সময় অনেক ছেলেই আমাকে ফলো করেছে।

প্রায় সব ছেলেরা এক স্বভাবের। শুধুই পিছু নেয়া। আর কিছু পারে না। অন্তত আমার সঙ্গে পারে না।

অন্য ছেলেদেরকে যেভাবে খসিয়েছি, এদেরকেও সেভাবে খসাতে হবে। রিকশাচালককে বললাম শান্তিবাগের দিকে যেন যায়। রিকশা যখন সালমাদের বাসার সামনে এলো তখন ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লাম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ছেলেগুলো এখনো এক জায়গায় দাড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে সাইকেল রয়েছে। সালমাদের বাসার গেটের ভেতর ঢুকে তাদের বাসার পেছন দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতেই সালমার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে আমাকে ডাকছে।

আমি সময় নেই বলে বেরিয়ে গেলাম।

ছেলেগুলোকে বোকা বানাতে পেরে মনে মনে হাসলাম। ওরা হয়তো এখন প্রতিদিন সালমাদের বাসার সামনে এসে দাড়িয়ে থাকবে। এক সময় সালমাকে অনুসরণ করবে। যখন দেখবে সালমা আমি নই, তখনো ওরা সালমার পেছনেই লাগবে। কারণ সালমা আমার চেয়ে সুন্দরী। তবে আমার হাসনাপুর চেয়ে নয়। হাসনাপুর এই রূপের জন্য আমার ভাবনা হয়। যদি কোনো ছেলে রাগ করে আপুর মুখে এসিড মারে তাহলে কি হবে?

আজকাল তো ছেলেরা যে কোনো কিছুতেই মেয়েদের মুখে এসিড মারে। এসিড মারার পর আপুর মুখ দেখতে কি রকম হবে সে দৃশ্য ভাবতেও চাই না।

সিংকাপন, মৌলভীবাজার থেকে

কাটা

– তাসলিমা নওরীন

আমার এক বান্ধবী যার সঙ্গে স্কুল জীবনে পরিচয়। তার সঙ্গে প্রায় এক বছরের মতো আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। এইচএসসি পরীক্ষার আগে অনেকে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়। আমিও হয়েছিলাম। বান্ধবীর সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা। তাই খুব গল্প করতে ইচ্ছা হতো। কিন্তু ক্লাসে কথা বলার উপায় ছিল না। আমরা একটা দোকানের সামনে দাড়িয়ে কথা বলতাম। দোকানের নাম *হলমার্ক।* ওখানে কার্ড আর বিভিন্ন ধরনের গিফট দেয়ার উপযোগী জিনিস বিক্রি হতো। দোকানিরা ছিল শিক্ষিত এবং স্মার্ট। আমাদের কোচিং সেন্টারে পড়ুয়া অনেক মেয়েই শুধু তাদের দেখার জন্য দোকানে ঢুকতো। কিন্তু কেনার উদ্দেশ্য নয়। আমরা মাঝে মধ্যে দোকানে ঢুকতাম। তবে বেশির ভাগই দোকানের সামনে দাড়িয়ে কথা বলতাম। একদিন ওই দোকান থেকে একজন বের হয়ে বললো, আপনারা এখানে দাড়াবেন না।

আমরা একটু সরলাম। তারপর থেকে তার নাম হলো মুড। দোকানে দুজন একটু বেশি আকর্ষণীয়। একজন মি. মুড, আরেকজন একটু মোটাসোটা। মেয়ে দেখলেই তিনি ছোক ছোক করতেন। আমার মুডকে বেশি ভালো লাগতো।

একদিন একটা কার্ড কিনবো। ওই দোকানে ফিক্সড রেট জানা সত্ত্বেও দাম কমাতে চাইলাম।

বললো, দশ পারসেন্ট কমাচ্ছি, আর না।

বললাম, দশ পারসেন্ট যে কমাতে পারে সে বিশ পারসেন্টও কমাতে পারে। এভাবে অনেক তর্কাতর্কির পর যখন রাজি হচ্ছিলেন না তখন শেষবারের মতো বললাম, দেবেন, না চলে যাবো?

মটকুটা বললো, কিছু দেয়ার কথা ছিল। এভাবে উল্টাপাল্টা কথা শুরু করলেন।

মি. মুড বললেন, আমি ধার দিই আপনাকে।

বললাম, আমার কাছে টাকা আছে। কিন্তু এটা আমি যা বললাম সেই দামেই কিনবো।

শেষ পর্যন্ত মটকু অনেক ফাজলামি করার পর বললো, আমি চার টাকা ধার দিই, তুমি পরে দিয়ে দিও।

কার্ডটা নিলাম। নিয়ে চলে এলাম।

তার পরদিন চার টাকা ফিরিয়ে দেবো এবং কার্ড কিনবো আরেকটা সেই উদ্দেশ্যে দোকানে ঢুকলাম। সেদিনই একজন বান্ধবীর জন্মদিন ছিল। তাই একটা কার্ড কিনে সেখানে কিছু লিখে দিয়ে দেবো। কিন্তু লেখার জন্য কলম বের করার সঙ্গে সঙ্গে কলমটা নিয়ে নিলো মটকু লোকটা।

মি. মুড বললো, তোমাকে কাল এতো ঝগড়ার পর এখানে আশা করিনি।

বললাম, অন্য দোকানে গেলে আপনাদের অপমান হবে না।

মি. মুড বললো, তা অবশ্য ঠিক।

বললাম, আমার কলমটা তিনি কেড়ে নিয়েছেন, একটু নিয়ে দিন।

মি. মুড বললো কেড়ে নেয়ার অনেক জিনিস আছে, কলম নিল কেন?

দুষ্টুমি করে ওনার গায়ে স্কেল দিয়ে মারলাম।

তিনি বললেন, কার্ড কিনলেন আরেকজনের জন্য, কলমটাও বলছেন আরেকজনের, আপনি মানুষটা কার?

বললাম, কারো না। এভাবে দুষ্টুমি করতে করতে তাদের সঙ্গে খুব ফ্রি হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন জিজ্ঞাসাও করেছি, কাতুকুতু দিলে সুড়সুড়ি পায়, ইংরেজি কি?

মি. মুড হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েরাও এসব কথা বলে।

বললাম, আসলে জান না তাই। তারপর বলে দিলাম পোকিং রিভস ইজ টিকলিং।

তাদের দুজনকে দুটো কলম গিফট দিয়েছিলাম।

একদিন দোকানে ঢোকার পর আমার ব্যাগের সঙ্গে লেগে একটা পারফিউম পড়ে যায়। আমাকে অবশ্য পরে দাম মিটিয়ে দিতে হয়েছে। যেদিন ভেঙেছিল সেদিন আমার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সবই নিয়েছিল। তাই ভয়ে পরদিনই দাম দিয়েছিলাম।

আমার একটা বদঅভ্যাস হচ্ছে ঠোট কামড়ানো। কিন্তু মটকু যে পরে এর অন্য ইঙ্গিত করবে বুঝতে পারিনি। কথায় কথায় একদিন বলেছিল, তুমি আমাকে খাওয়ালে আমিও খাওয়াবো।

বললাম, খাওয়ান।

তিনি তার বাসায় নিতে চাইলেন। আমি রাজি না হওয়ায় বললেন, একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবেন। আমি একা যাবো। না হলে তিনি এতোজনকে খাওয়াতে পারবেন না। সে জন্য বান্ধবীদের দোকানে রেখে ওনার সঙ্গে গেলাম। ভাবছিলাম তিনি দুষ্টুমি করছেন। আমার মনে তার প্রতি দুর্বলতা মোটেও ছিল না। শুধু দুষ্টুমি করতাম এবং আমার ধারণা ছিল তিনিও তাই।

গেলাম তার সঙ্গে। রিকশায় উঠলাম। ওঠার পর মনে হলো, আমি তো অনেক মোটা মেয়ের সঙ্গে বসেছি, এখন বসতে পারছি না কেন? তারপর বুঝলাম তিনি চেপে ধরেছেন। বলছেন, ওখানে গিয়ে মোটেও চিৎকার করবে না, দোকানে জোরে কথা বলতে, ওখানে যা বলবো তা-ই শুনবে।

আমার সন্দেহ হলো, রিকশাচালককে বললাম, আপনি থামান। তারপর নেমে গেলাম।

তিনি আমার পাশে এসে বললেন, তুমি আমায় অপমান করছো।

বললাম ঠিক আছে, আমি সবাইকে বলবো, আমি খেয়েছি, হলো?

তিনি পাশে একটা রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে বললেন, এখানে চলো।

আমি গেলাম। এমন জায়গায় বসলাম যেখান থেকে সবাই আমাদের দেখতে পাবে। খাবারের অর্ডার দেয়া হলো। তারপর তিনি তার খেলা শুরু করলেন যেন। আমার চুল খুলে দিলেন। আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আঙুল মটকে দিচ্ছেন।

এতো বিরক্ত লাগছিল। তবু চুপ করে ছিলাম। কারণ উঠে যেতে হলে প্রথমে তাকে উঠতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব না। তিনি তার কাজে ব্যস্ত। কাটলেট কাটছেন, খাচ্ছেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ঠোট চেপে ধরলেন ঠোট দিয়ে।

যখন ছেড়ে দিলেন তখন মনে হলো ঠোটে নোংরা লেগে আছে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল, কেন আসতে গেলাম?

তারপর তার হাত আমার সমস্ত পিঠে চরে বেড়াচ্ছিল। আবারও চুমু খাওয়ার চেষ্টায়। আমি ছটফট করাতে ঠোটের নাগাল না পেয়ে ঠোটের পাশে। তারপর আরেকটা কাধে।

বললাম, ডিসগাস্টিং।

তিনি বললেন, এবার আমাকে একটা কিস করো।

চুপ করে রইলাম। ঘেন্না লাগছিল ভীষণ। আমি আবার বললাম, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তবু তিনি শুনলেন না। বের হতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারপর রিকশা নিয়ে বাসায় চলে এলাম।

তার পরদিন কোচিং করতে গিয়ে দেখি তিনি লাল গেঞ্জি আর জিনস প্যান্ট পরে এসেছেন। আমি ক্লাস শেষে আমার বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করছি। তখন তিনি এসে বললেন, এতো কড়া রোদে দাড়িয়ে থেকো না। দোকানে যাও। এসি আছে।

তার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না লাগছিল। তাই দোকানে ঢুকলাম।

মি. মুড হাসলেন তারপর বললেন, গতকাল ওই পরিবেশে ওই পরিস্থিতিতে কিছু হয়নি বিশ্বাস করা মুশকিল।

বললাম, কিছু হয়নি।

এরপর যখন কোচিং সেন্টারে পড়া শেষ করে চলে এসেছি তখন থেকে একটা কাটা বুকে বিধে আছে। এই কাটাটা মাঝে মধ্যে যন্ত্রণা দেয়। মনে হয়, কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়লে যদি সে শুনে ব্যাপারটা মেনে না নেয় তখন কি হবে?

পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

বোরিং

– আ. ইব্রাহিম

ভোরবেলায় বাবার ভয়ংকর চেচামেচিতে মিথুনের ঘুম ভাঙে। ঠাণ্ডায় বাবার এমনিতেই গলা বসা, তার ওপর রাগের চোটে ভোরে চিৎকার দিলে ভৌতিক এক ধরনের শব্দ বের হয়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই মিথুন ভুলে যায় আজকে ঈদ। সকালবেলায় এতো তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা এবং বাবার ধমক শোনা এসব কিছুই একটা তিক্ত ভাব নিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে। মনে মনে ইংরেজিতে কিছু গালি দিয়ে টয়লেটে ঢোকে। কিন্তু এতো ভোরে গোসল করার অভ্যাস তার নেই। তার উপর শীত শীত করছে। গরম পানি থাকলেও গায়ে ঢালতে ইচ্ছে করে না। যাই হোক। এর চেয়ে ভালো আয়নায় নিজের চেকনাই চেহারাটার ভাঙা গড়ার হিসাব নেয়া। কিন্তু না, দরজা পেটানোর শব্দে চেহারার প্রসন্নতা বাক নেয় বাংলা পাচের দিকে।

মিথুন, তাড়াতাড়ি বের হ, নামাজ তো শুরু হয়ে যাবে, ইডিয়ট!

ইডিয়ট শব্দটা মিথুন উৎকণ্ঠা নিয়ে শোনে। যতো না নামাজ পড়ার গরজ তারচেয়ে বেশি *ইডিয়ট* উপাধি পাওয়ার অপমানে গায়ে পানি ঢালা শুরু করে দেয়।

তাড়াতাড়ি গোসল করে নতুন পাঞ্জাবিটা পরে এবং একটা জায়নামাজ নিয়ে মিথুন বাবার সঙ্গে ঈদগায় রওনা দেয়।

প্রচণ্ড ভিড়। এই তো সুযোগ বাবার যন্ত্রণা থেকে বাচার। সে ভিড়ের এক ফাকে তার বাবা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। এই না হলে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে!

খুৎবা শুরু হয়েছে। জায়নামাজ বিছিয়ে বসে পড়লো। হঠাৎ তীব্র আতরের গন্ধে মিথুনের খালি পেট গুলিয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে পাশে তাকাতেই চোখাচোখি হয় এক বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে। লোকটি তার সঙ্গে এক পরম প্রশান্তি আর আনন্দের হাসি বিনিময় করে। তার হলুদ দাত ঝিকিয়ে ওঠে দিনের প্রথম আলোয়। পকেট থেকে বিশাল এক আতরের শিশি বের করে আনে।

লজ্জা করেন ক্যান ভাইজান, আইজকা ঈদের দিন, লন, একটু আতর লন। আমিই মাখাইয়া দি, দ্যান।

মিথুন প্যারালাইজড রোগীর মতো অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখলো এক বৃদ্ধ লোক তার হাতটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মতো সেখানে তীব্র গন্ধের আতর লাগিয়ে দিচ্ছে। কি দুঃস্বপ্ন!

নামাজ শেষে কোলাকুলির পালা। কিন্তু তার এক হাতে স্যানডাল, অন্য হাতে জায়নামাজ। খুব কৌশলের সঙ্গে কোলাকুলি করতে হচ্ছে।

ঈদগা থেকে বের হয়েই রিকশা নিয়ে বাসার দিকে রওনা হয়। রিকশা যখন প্রায় বাসার কাছে তখনই এলাকার কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা। রিকশা বিদায় করে বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি সারার পর তারা প্রস্তাব দিল তাদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘোরার জন্য। ঈদের দিন। বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আর পনেরো মিনিট পরেই এইচবিও চ্যানেল একটা মজার কমেডি সিনেমা আছে। তাই মিথুন বললো, আজ না, আরেকদিন।

বন্ধুরা কমেডি সিনেমার নায়কের মতোই তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে চলে গেল।

মিথুন মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

বাসায় ঢুকে দেখা হলো বাবার সঙ্গে। নামাজ থেকে ফিরে সেমাই খাচ্ছেন। তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, তুই কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি?

মিথুনের উত্তর রেডিমেড, আমারও তো একই প্রশ্ন!

টেবিল থেকে এক বাটি সেমাই নিয়ে সে তার রুমে ঢুকে টিভি অন করলো। টিভিতে এরিক মারিয়া রেমার্কের *অল কোয়াট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট* হচ্ছে। মিথুন কখন *অল কোয়ায়েট অন দি ঈদ ফ্রন্ট* হবে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ঈদ ফ্রন্টের আক্রমণ শুরু হয়েছে ঈদের আগের দিন সন্ধ্যা থেকে। ওয়ার মুভির পর টিভিতে তখন একটা অসাধারণ মিউজিক ভিডিও চলছিল। কিন্তু কোথা থেকে ছোট বোনটা এসে রিমোট টিপে বিটিভি দিল। সেখানে *রমজানের ওই রোজার শেষে* গানটি বাজছে।

মিথুন হাত-পা সেটে সোফায় বসে বিষাদের সঙ্গে দেখলো বাসার সকল সদস্য, কাজের বুয়াসহ বিমল আনন্দের সঙ্গে ওই গান শোনার জন্য জড়ো হয়েছে। সবার মুখেই বিগ সাইজের ক্লোজআপ হাসি।

যাই হোক। ঈদের দুপুরটা নানান ধরনের খাবারের কল্যাণে তার ভালোই গেল। তারপর দুপুর থেকে শুরু হলো বাংলা চ্যানেলে ঈদের অনুষ্ঠান দেখার যন্ত্রণা। বাসার সব সদস্যই ঈদ উদযাপন করতে বিটিভি খুলে বসেছে। বছরের এই একটা দিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিটিভির অত্যাচার মিথুনকে সহ্য করতে হয়। সেই যন্ত্রণা শেষ হয় রাত সাড়ে দশটার বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দিয়ে। এ ধরনের ম্যাগাজিন দেখে তার পিস্তলের ম্যাগজিনের কথা মনে আসে। উপস্থাপক আর প্রযোজকের মাথায় একটি করে গুলি ঢুকিয়ে দেয়ার মতো ভয়ংকর সব পরিকল্পনা মাথায় খেলে তার।

সবশেষে বদহজম নিয়ে রাতের বেলা ঘুমাতে যায় সে।

মাঝরাতে ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে ওঠে। স্বপ্নটা বীভৎস। ঘুমের মধ্যে সে দেখে বিটিভির *আনন্দমেলা*-র উপস্থাপক একটা বড়সড়ো ছুরি নিয়ে তাকে তাড়া করছে। উপস্থাপকের গা থেকে তীব্র আতরের গন্ধ বের হয়। মিথুনের পেট পাক দিয়ে ওঠে।

এভাবেই শেষ হয়ে যায় তার আরেকটি বোরিং ঈদ।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

ভাংতি টাকা

– দীনা মরিয়ম

আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্রী। সে বছর রোজার ঈদ অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন সকালবেলা আব্বা-আম্মাকে সালাম করে বান্ধবীর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে পৌছে দেখা গেল, রিকশাচালকের কাছে ভাংতি টাকা নেই। আমি তাকে বাইরে দাড় করিয়ে ভেতর গেলাম বান্ধবীর কাছে টাকা ভাঙানোর জন্য। কেননা আশপাশে টাকা ভাংগানোর মতো কোনো দোকান বা রিকশাচালক নেই। এমনকি একটা বড় মানুষও নেই রাস্তায়। কিন্তু ভেতরে গিয়ে বান্ধবীর মায়ের সামনে পড়লাম প্রথমে। তাকে সালাম করতেই তিনি

বললেন, বান্ধবী ভেতরেই আছে। আমি ভেতরে গিয়ে বান্ধবীর সঙ্গে হই চই শুরু করলাম। তারপর এলো খাওয়ার পালা। খেতে খেতে ঠিক করলাম কোথায় কোথায় যাবো। কখন কার বাসায় যাবো...ইত্যাদি।

খাওয়া শেষ করে দুজন বের হলাম। সে রিকশা ডাকতেই মনে পড়লো আমার কাছে ভাংতি টাকা নেই। হায় খোদা! আমি যে রিকশাচালককে দাড় করিয়ে...। মনটা খারাপ হয়ে গেল বৃদ্ধ রিকশাচালক কথা মনে করে। বেচারা! না জানি কতো খারাপ ধারণা নিয়ে চলে গিয়েছিল সেদিন। আর কখনো ভাড়া না দিয়ে কারো বাসায় ঢুকি না।

চট্টগ্রাম থেকে

শুটকি কেচ্ছা

– সায়ফুল ইসলাম

মিষ্ট আমেজ নিয়ে ঘনিয়ে আসছে মিষ্টি মুখের ঈদ। সর্বত্র চলছে ঈদ প্রস্তুতির তোড়জোড়। সে সঙ্গে নানান রুচি ও স্বাদের সেমাই ও মিষ্টির উপকরণ সংগ্রহের হিড়িকও। ঈদের দিনে জর্দা–সেমাই আর ফিরনি–পায়েসের রকমারি আয়োজন ঈদ বৈচিত্রের এক আনন্দ ভোজের দিক। ঈদ এবং মিষ্টিমুখ এ যেন একটি মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ।

ঈদ উৎসবের এই মিষ্টি আমেজ প্রবাসে আমাদের মেস জীবনেও সুখ–দুঃখের এক মিশ্র দোলা দিয়ে যায়। আনন্দ নিরানন্দে দোলায়িত এই ঈদ উদযাপনের লক্ষ্যে কষ্টায়ত্ত রন্ধন বিদ্যার যাবতীয় ফর্মুলা প্রয়োগ করে হালুয়া–রুটি, মন্ডা–মিঠাই এবং ভালো–মন্দের যৎ সামান্য আয়োজনে আমরাও প্রয়াসী হই।

তবে এবারের এই আয়োজনে পরোক্ষ বাদ সাধতে চাইছে আমাদেরই প্রতিবেশী একটি নতুন পলি ক্লিনিক। আমাদের কিচেনের বেশ কয়েক গজ পেছনে ক্লিনিকটির সম্মুখস্থ খোলা চত্বর। তাদের অভিযোগ যে, কিচেনের একমাত্র ও ছোট্ট ভেন্টিলেটর গলিয়ে রান্নার তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছে ওই চত্বরে। ফলে পরিবেশ দূষণের কারণে তাদের ভিজিটর ও রোগীদের স্বাস্থ্যহানিসহ প্রভূত সমস্যা হচ্ছে। তাই তাদের আদেশ ও অনুরোধ যে, ভেন্টিলেটরটি যেন বন্ধ করে দেয়া হয়।

তাদের এই উদ্ভট অভিযোগ ও অযৌক্তিক আবদারে আমরা বিস্মিত হলাম। অথচ আমাদের ফ্ল্যাটে এমন কোনো আমির–ওমরাহ বা ভিআইপি গোছের কেউ অবস্থান করেন না যে, তাদের নিয়োজিত বাবুর্চিরা নিত্যদিন দামি ঘি আর বাহারি মসলাযোগে রান্না–বান্না নিয়ে গলদর্ঘম হচ্ছে। বরং ব্যয় সংকোচের লক্ষ্যে প্রায় মশলাবিহীন রান্নায় কৃপণ হস্তে শস্তা দামের যে তেল ঢালা হয় তাতে হাড়ির অভ্যন্তরে নাক গলিয়েও রান্নার কোনো সুবাস পাওয়া যায় না। অথচ বাইরে রান্নার সুবাসে চতুর্দিক মৌতাত এমন অভিযোগ নিতান্তই হাস্যকর মনে হলো।

তবে হ্যা, রেসিপিতে শুটকি আইটেমের অনুপ্রবেশ ঘটানো হলে এর উৎকট সৌরভ যে নাসারন্ধ্রে তীব্র আঘাত হানতে পারে তা বলাই বাহুল্য। শুটকির এই বিটকেলে সুবাস অতি দ্রুত কিচেনের ফাকফোকর গলিয়ে চতুর্দিক বিমোহিত করে মানব কুলের অস্বাভাবিক চিত্ত চাঞ্চল্যের এবং অস্বস্তির মহাকারণ হতে পারে তা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য।

তবে সুখের বিষয় যে, এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা শুটকিতে একান্তই নিরাসক্ত। আর সুখের দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এখানে তাজা মাছ যতোটা সুলভ ও শস্তা, শুটকি ততোটা মোটেও নয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকা প্রবাসী আমার এক আত্মীয়ার কথা মনে পড়লো। সিদল শুটকির অসম্ভব ভক্ত তারা। তাদের খাবার রুচির হ্রাস–বৃদ্ধিতে শুটকির ভূমিকা সর্বোচ্চ। সেই তাদের কিচেনের পেছনেই স্থানীয় এলাকাবাসীদের চলাচলের রাস্তা। সিদল শুটকির ভর্তা চটকানোর দিনগুলোতে তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে

যে, পথচারীরা তাদের কিচেন বরাবর এলেই দ্রুত নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঝড়ের গতিতে ওই স্থানটি পার হয়ে যাচ্ছে।

শুটকির উৎকট গন্ধ তাদের এতোটা বিচলিত করলেও স্বস্তির বিষয় হচ্ছে যে, এ যাবৎ পথচারীদের কেউই এটাকে আমাদের সুযোগ্য নেত্রীদের মতো একটা ইসু বানিয়ে ভেন্টিলেটর বন্ধের দাবি তুলে বা শুটকি রান্নার প্রতিবাদে হরতাল, ভাংচুর, হামলা মামলা বা মানববন্ধন জাতীয় কোনো কর্মসূচি নেয়নি। ফলে আত্মীয়ারাও নির্বিঘ্নে পরম তৃপ্তিতে শুটকির ভর্তা খাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে চলেছে।

দেশ থেকে শুটকি চালানের যে অর্ডার আত্মীয়ারা মাঝে মধ্যে পাঠিয়ে থাকেন তার পরিমাণ শুনলে পাঠকরাও বিস্মিত না হয়ে যাবেন না। এই অর্ডার মোতাবেক শুটকি কিনতে একবার কারওয়ান বাজারের আড়তে গেলে শুটকির পরিমাণ শুনে আড়তদার জানতে চাইলেন ক্রেতার ব্যবসাস্থল কোথায়। না, কোনো ব্যবসার উদ্দেশ্য নয়, নিছক খাওয়ার উদ্দেশ্যেই এ পরিমাণ সিদল কেনা হচ্ছে শুনে আড়তদারও অবাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত ক্রেতার মুখ পানে চেয়ে থাকেন।

শুটকি কেনার পর আড়ত ঘুরে দেখা ক্রেতার মন্তব্য হলো, গাজানো শুটকির আড়তে ইয়া বড় বড় শত সহস্র পোকার কিলবিল দেখলে ভোক্তাদের এতো আগ্রহ ভরে শুটকি খাওয়ার খায়েশ নিমেষে উবে যাবে।

মহাজন অবলীলায় দুই হাতে পোকা সরিয়ে শুটকি মেপে কাস্টমারের হাতে তুলে দিচ্ছে। কখনো আড়ত না দেখা ভোক্তাকুল ওই পোকার গামলা থেকে তুলে আনা শুটকি পরমানন্দে গলাধঃকরণ করে চলেছেন।

আমাদের কিচেনটি জানালাবিহীন। কিন্তু ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের আবদারে কিচেনের ভেন্টিলেটর বন্ধ করতে বোর্ডাররা বিলকুল নারাজ। রান্নার পাট চুকিয়ে অভুক্ত থাকাও সম্ভব নয়। আবার তেমনি এক বাসা ছেড়ে ব্যাচেলরদের পক্ষে অন্যত্র বাসা খুজে পিঠ ঠেকানোর ব্যবস্থা করার ঝক্কিঝামেলা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন।

এই ভেন্টিলেটর গলানো সুবাস-কুবাস ক্লিনিকের সমস্যা হতে পারে, আমাদের নয়। তাই সবার এক কথা, বন্ধ করতে হয় ক্লিনিক বন্ধ করা হোক। এ যে ভেন্টিলেটর বন্ধ করা নয়, প্রকারান্তরে আমাদের খাওয়া বন্ধ ও বাসায় তালা ঝোলানোর পায়তারা। এই মতলবি চাল সফল হতে দেয়া যায় না। তবে আশার বিষয় হচ্ছে, ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয়বার আর এ প্রস্তাব নিয়ে এ মুখো হয়নি। হয়তো এই পক্ষের সরব হয়ে ওঠার আশংকায় ওই পক্ষ নীরব হয়ে গেছে।

ঈদের এই মহোৎসবকে মিষ্টি মুখর করে তুলতে আমাদেরও প্রাণান্তকর তোড়জোড় চলছে। ঈদের একরাশ শুভেচ্ছাসহ আমাদের এই আয়োজনে আপনারাও সাদর আমন্ত্রিত। আমাদের একান্ত প্রত্যাশা যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের এই মিলন দিনেও আমাদের নেত্রী খালেদা-হাসিনার দুইদিক পানে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতো আপনারাও আমাদের বিমুখ না করে এ দিবসের মহান আবেদন রক্ষায় আমাদের আমন্ত্রণে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়ে এই বিরহকাতর প্রবাসীদের প্রতি সৌহার্দ ও একাত্মতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনে আন্তরিক হবেন।

পরিশেষে ঈদের এই আনন্দলগ্নে নিজ গৃহবাসী আমার সেই সব প্রিয় মুখগুলোর স্মরণ করছি যাদের সুখ সমৃদ্ধি এবং কল্যাণকল্পে আজ সুদূর মরু প্রবাসী হয়েছি।

জেদ্দা, সউদি আরব থেকে

সম্রাট

– মিজানুর রহমান বাদশা

মেয়েটি কালো থেকে একটু উপরে, ফর্শা থেকে নিচে। অতএব শ্যামলা। কিন্তু যথার্থ শ্যামলা নয়, কিঞ্চিৎ নিচে। একে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্যামলা বললেই ঠিক হয়। গ্রামের মেয়ে হিসেবে সে খাটো এবং লম্বার মাঝামাঝি।

শরীরে যদি কৃত্রিমতার মাত্রা বাড়িয়ে চলতে পারতো তবে অনেকের মনের চেয়ারে সারা জীবন আসীন হওয়া কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু কৃত্রিমতার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও অর্থ তার ছিল না বিধায় মাত্র এক দিন কিংবা এক রাত আপন করে পাবার সাধ অনেকেরই ছিল এবং অনেকে এখনো চান্সে থাকে।

যে স্থান ঢাকার জন্য অতিরিক্ত কাপড় ব্যহৃত হয় তা প্রয়োজন মতো স্ফীত। অতএব দৃষ্টি এখানে খানিকক্ষণ নিবন্ধ। পেছন দিকের মাংসপিণ্ড দুটি পদব্রজের চপল ছন্দে ওঠা–নামা করে, এখানেও দৃষ্টি খানিক দাড়ায়, সঙ্গে বুকের মাঝে কামনার ঢেউ তীরে আছড়ে মরে।

মেয়েটির নাম হামিদা। মুখের গড়ন চমৎকার।

যে দেলুর ফোনের দোকানে কাচের দেয়ালের ভেতরে মাঝে মধ্যে যাতায়াত করে থাকে তার নিজেরও মোবাইল আছে। তবুও এখানে আসতে হয়। কেননা অনেকেই তার নাম্বারটা জানে না এবং যারা নতুন তারা দেলুর নাম্বার সম্পর্কে জ্ঞাত। এখানে রুটিন জানতে এবং জানাতে সে আসে। একটু নির্জন হলে দেলুর সঙ্গে মিষ্টি কথার দেয়া–নেয়া হয়।

দেলোয়ার মিয়া ওরফে দেলু বিদেশ ফেরত। দেশে ফেরার পরে মুখের সিগারেট যখন বিড়ির কাছাকাছি এলো তখন বৌ–এর ধাক্কাধাক্কিতে একটি দোকান নিল। এখানে অডিও ক্যাসেট বিক্রি, ভিসিপি সেট ভাড়া ও রেডিও–টেলিভিশন মেরামত করার সঙ্গে এই মোবাইল সার্ভিস। বেশ ভালোই চলছে তার । বেশ কিছু টাকার মালিকও সে হয়েছে। তাই তো রঙ্গীন স্বপ্নগুলো কাছে ঘেষতে শুরু করেছে । তার মনটা মাঝে মধ্যেই এলোপাথাড়ি চলে। কারো একাকীত্ব এবং অসহায়ত্ব তার কাছে ভালো লাগে না। আর সে জন্যই বোধহয় মালেকের বিধবা মেয়েটাকে দশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয় দেলু। অবশ্য তার মনে স্বস্তি এতোটুকুই যে, কাজটা হয়েছে । কিন্তু অস্বস্তি হলো, একদিনের হিসাব করলে চার্জটা একটু বেশি এই যা। ধরা পড়ে সালিশির মাধ্যমে টাকা প্রদান কি না তাই দেলুর বৌ–এর মাথা নত থাকে দিনের অনেকটা সময়। তবুও জীবন চলছে একই ঘরে, একই চালের নিচে।

আগামীকাল ঈদ। বৌ গিয়েছে বাপের বাড়ি। অতএব ঈদের আগাম আনন্দ প্রকাশের জন্য আজকে রাতে একটু ফূর্তি করা দরকার। সঙ্গে এসে জুটলো রফিক। অতএব হামিদা। কোথায় হবে কাজ। বাড়িতে কিংবা দোকানে কোথাও হবে না। শেষে ঠিক হলো কলাবাগানে । মানুষজন সকাল সকালেই ঘুমিয়ে ছিল। ঈদের দিন, সকালে উঠতে হবে সে জন্য। যখন অন্ধকারের বেড়া সারা গ্রামকে পৃথক করে নিল, জনমানবের দৃষ্টি সীমিত করে দিল। তখনই মাঝে টাকার চালান উঠানোর, টাকা আয়ের এবং জৈব প্রবৃত্তির আনন্দের উদ্দামতা ক্রমেই শীতল হতে থাকলো।

পরদিন সর্বজন কাম্য একটি পরিচ্ছন্ন আনন্দ সবার চারদিকে সমান সাড়া দিয়ে শুরু হলো। আজকে ঈদ, আজকে সবাই ভুলে যাবে অতীতের দুঃখ। আজকে প্রিয়জনকে কাছে পাবার আনন্দ পরিপূর্ণ হবে।

গত দিনগুলোর চেয়ে আজকে মনের আবেগ পুরোপুরি নিঃশেষ করার সাধ পূরণ হবে। এটি সবার বেলায়ই প্রযোজ্য বিধায় সাধ মেটানো যায় যদি সামর্থ থাকে। ঈদের দিবাগত রাত দেলু শ্বশুরবাড়ি এলো। খাওয়া–দাওয়া হলো, গল্প হলো, আড্ডা হলো। রাতের গভীরতা সাত বছরের ছেলেটার চোখে ঘুম এনে দিয়ে তাদের দুজনকে নিরিবিলি করে দিল। অতএব আজকেরটা স্পেশাল। সিগারেট ছোয়া ঠোট দুটো লিপস্টিক ছোয়া ঠোট দুটোতে ক্রমেই পরশ বোলাতে লাগলো। ক্রমে আরো অন্তরঙ্গ হলাম।

এক সময় উত্তেজিত কণ্ঠে গায়ের ভাষায় শোনা গেল, *জাইর‍্যা, নিত্তি যে রহম করে, আইজক্যাও হেই রহম। ক্যা জাইর‍্যা, মারন মারো না, আবার নটি বাড়ি যাও। দশ হাজায় ট্যাহা জরিমানা দেও। অহন যা জাইর‍্যা, হামিদার কাছে* ইত্যাদি।

এ জন্যই বোধহয় বৌ–এর মুখের ওপরে মুখ তুলে কথা বলে না দেলু। মাঝে মধ্যে বৌকে ধরে পেটান দেয় সত্য। আর যাই হোক। গায়ের জোরে বৌ পেরে ওঠে না। কিন্তু হাতিয়ার মুখে একটাই, *কি রে আমার পুরুষ পুলা রে। খালি বৌ মারার বেলায়।*

সংসার যুদ্ধে যারা পরাজিত সম্রাট, পররাজ্য অধিকার করার সাধ তারা হামেশাই পোষণ করে। গ্রাম বাংলার হাজারও ঘর ভাঙার জন্য গৃহবধূর আত্মহত্যার মতো অপরাধের জন্ম দেয় এই দেলুর মতো লোকেরা।

সাভার, ঢাকা থেকে

কাকিমা

– ইমন

আমার বয়স তখন পনেরো বছর। সবেমাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ি। কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম ভালোবাসা কাকে বলে। আমি তার কাছে যেতে পারতাম না। কারণ সে ছিল খুব সুন্দর আর স্মার্ট। তার কাছে যেতে চাইলে আমার খুব ভয় করতো।

অনেক সাহস সঞ্চয় করে ভয়ে ভয়ে তার কাছে যেতাম। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতাম না। আমি কাছে গেলে কখনো বিরক্ত হতো না। এ কারণে তাকে আমার আরো ভালোলাগতো।

একদিন সে আমাকে একটি ডিটেকটিভ গল্প শোনালো। সে যখন গল্প বলতো তখন শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কি যে সুন্দর গল্প বলার ভঙ্গী! ইচ্ছে করতো নাওয়া–খাওয়া বাদ দিয়ে দিন–রাত শুধু তার গল্প শুনি।

আমার গল্প শোনার আগ্রহ দেখে প্রায় আমাকে গল্প শোনাতো। এভাবেই তার প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এতো বেড়ে গেল যে তাকে এক মুহূর্ত না দেখলে ভালোই লাগতো না। কোনো কাজেই ঠিকমতো মন বসতো না। সে যদি কোথাও যেতো, একদিন বা দুদিন থাকতো, যখন ফিরে আসতো তখন তার সঙ্গে কথাই বলতাম না।

এভাবেই কিছুদিন যাওয়ার পর আস্তে আস্তে তার সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। একদিন গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গেলো। বললো, আমার কাছে থাকো।

মনে মনে যা চেয়েছিলাম তাই হলো। এভাবে তার কাছে, তার বিছানায় অনেক রাত থেকেছি। হিসাব করা যাবে না।

তার একটা ছোট মেয়ে ছিল। সে আমাদের মাঝখানে থাকতো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে আমি যাকে ভালোবাসি সে আর কেউ নয়, সে আমার আপন কাকিমা।

কাকিমাকে এতো ভালোবাসে হয়তো কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার মনে হয় পৃথিবীতে প্রেমিক–প্রেমিকা কেউ এতো ভালোবাসে না। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আমার ভালোবাসা বেশি দিন ভাগ্যে ছিল না। কাকার সঙ্গে কাকির ঝগড়া সব সময় লেগেই থাকতো।

কাকা মধুপুর মিশনে চাকরি করতেন। বাড়িতে এলেই ঝগড়া শুরু হতো। বর্তমানে কাকা কক্সবাজার থাকেন। কাকা এক মাস পর পর বাড়িতে আসতেন। তবুও মনের মিল হতো না। কাকি এক পর্যায়ে কাকাকে ডিভোর্স দিয়ে দিলেন। কাকি চলে গেলেন ঢাকায়। ঢাকা থেকে কাকি করটিয়া এলে তার সঙ্গে গোপনে দেখা করতাম। হঠাৎ আমাদের বাড়ির সবাই ব্যাপারটা জেনে গেল। এ নিয়ে আমাকে কাকার হাতের মারও খেতে হয়েছে। কিন্তু আমার কাকাও ছিলেন খুব ভালো মানুষ।

শুনেছি কাকি তার বোনের বাসায় থাকেন। কাকির সঙ্গে আর দেখাও করিনি। কাকির একটা মেয়ে আছে। নাম উর্মি। ক্লাস সিক্সে পড়ে। উর্মিকে আমি খুব ভালোবাসি।

আমি যদি কারো সঙ্গে প্রেমও করি তাহলেও কাকির মতো ভালোবাসতে পারবো না। কারণ কাকির প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল শ্রদ্ধার। যদি কোনোদিন চলার পথে কাকির সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তার সঙ্গে কথা বলবো না, শুধু চেয়ে থাকবো তার সুন্দর মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করবো, কেমন আছেন?

করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে

বিগত দিনে

– নুরে আলম

বিগত দিনের ঈদগুলো কিভাবে কাটিয়েছে তা চিন্তা করতে গিয়ে নিচের ঘটনাগুলো স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো।

এক. ছোটবেলায় পরীক্ষার পর ঈদ থাকলে পড়াশোনার চাপে ঈদ ভালো মতো করা হতো না। ঈদের দিনও টেনশন কাজ করতো কিংবা পড়তে হতো।

দুই. এক ঈদে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসার সময় সাইকেলের সঙ্গে এক্সিডেন্ট করে ঠোট কাটলাম। ফলে হাসপাতালে গিয়ে সেলাই নিতে হলো। নিজের ঈদ পণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও টেনশনে ফেললাম।

তিন. কোনো কোনো বছর রোজার ঈদ ঢাকায় করতাম এবং কোরবানির ঈদ সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে করতাম। কিন্তু ঢাকাতে করতেই মন বেশি চাইতো। কারণ বন্ধুরা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা ঢাকায় থাকতো। তারপরও দাদা–দাদি ও অন্য আত্মীয়স্বজনদের জন্য দেশে যেতে হতো।

ঈদের দিন ফজরের পর থেকেই মাইকিং শুরু হতো যে, আটটা বা সাড়ে আটটায় ঈদের জামাত শুরু হবে। অথচ আমরা নিশ্চিত জানতাম যে, দশটা সাড়ে দশটার আগে জামাত শুরু হবে না। তাই আমরাও সেভাবে আস্তে–ধীরে ঈদগাহের দিকে যেতাম।

চার. এক ঈদের দিন ঈদের বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে নামাজ পড়লাম। সেও এক অন্য রকম অনুভূতি।

পাচ. একবার এক আত্মীয়কে দেখলাম ঈদের নামাজ নিজ মহল্লায় নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে পারেননি। তখন অনেক ঘুরে কোথায় দেরিতে হয়ে জামাত সেখানে নামাজ পড়ে আসার গল্প শুনতাম।

ছয়. এসএসসি পরীক্ষার পর যেই রোজার মাস ছিল তা নানার তবলীগে পাঠানোর বদৌলতে আল্লাহর রাস্তায় কাটালাম। অন্য রকম অভিজ্ঞতা।

সাত. বড় হওয়ার পর সাধারণত ঈদগুলোতে বাবা মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়ে বের হতাম এবং মুরুব্বি শ্রেণীর যেসব আত্মীয়স্বজন রয়েছেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হতাম। সারা বছরে যাদের সঙ্গে দুই একবার দেখা হয় তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে দিনটা ভালোই পার হতো।

আট. কিছু কিছু ঈদে আত্মীয়স্বজনদের অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও মেহমানদারির জন্য পেটের পীড়াতেও ভুগতে হয়েছে।

নয়. কিছু কিছু ঈদ এমনিতেই কোনো কাজ না করে ঘরে বসে বই পড়ে কিংবা শুয়ে–বসে কাটিয়েছি।

দশ. ইদানীংকার ঈদে চেষ্টা করি ঈদের নামাজ পড়ার পর পরই কবরস্থান জিয়ারতে যেতে। যেসব প্রয়াত আত্মীয়স্বজন রয়েছেন তাদের কবরে ঈদের দিনে গিয়ে দোয়া–দরুদ পড়েও অন্য রকম আনন্দ ও তৃপ্তি মিলে। বনানীর কবরস্তানে তো রীতিমতো মানুষের মিলনমেলা হয়ে যায় এবং এতো লোকজন তাদের পরলোকগত আত্মীয়দের স্মরণ করে এভাবে আসে দেখে এক অন্য রকম ভাব জাগে মনে।

এগারো. কোরবানির ঈদে কোরবানির গরু কিনে আনাটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ মনে হয়। তাও ইদানীং কয়েক বছর বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অন্যদের ঈর্ষা জাগিয়ে কোরবানির পশু কিনেছি জেতা দামে। দুই একবার জবাইও করেছি জামা–কাপড় রক্তে রঞ্জিত করে।

বারো. এক ঈদের তিন দিন পর এক যুবা বয়স্ক আত্মীয় মারা গেল। তারই কয়েকদিন পর এক খালু। এ কারণে সেই ঈদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়।

তেরো. একবারের ঈদে বিশেষ সংখ্যায় লেখা বের হলো। সে বছর পেয়েছি এডভান্স ঈদের আনন্দ।

চোদ্দ. এক রোজাতে মিয়া–বিবি দুজনেই ছিলাম আল্লাহর রাস্তার সফরে। মহিলারা বাসায় থাকতেন। ঈদের পরদিন ঢাকায় কোনো এক বাসায় ওঠার কথা। কোনো বাসা নির্দিষ্ট না থাকায় নিজের শ্বশুরবাড়ির মহল্লাতেই জামাত নিয়ে উঠলাম। স্ত্রী ও মহিলারা শ্বশুরবাড়িতে। সেটাতেও ডাবল ঈদ।

এসব চিন্তা করে দেখলাম ঈদ সম্বন্ধে আসলে আমরা যা কল্পনা করি সেটা তারচেয়েও বেশি বৈচিত্রময়, রোমাঞ্চকর এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। যদিও জীবনের ঘটনাপ্রবাহে অনিবার্যভাবে বেদনাদায়ক অনেক ঘটনা ঘটে ঈদের দিনে তবুও ঈদ ঈদই এবং সব সময়ই সবার জন্য আনন্দের বার্তাবাহী। সবার জীবনে ঈদের অনাবিল সীমাহীন আনন্দের আবির্ভাব সর্বদা ঘটুক এই কামনায় শেষ করছি।

পনেরো. সর্বশেষ যেই ঈদটি কাটিয়েছি এবং যার বর্ণনার ওপরেই একটা লেখা হতে পারতো তার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্যভাবে এবার হজের সফরে গিয়েছিলাম যা ছিল আশাতীত এবং অভাবনীয়। আরবের বুকে ঈদুল আজহাসহ যেই এক মাস সময় কাটিয়েছি তার বর্ণনা কলেবরে অত্যন্ত বড় হবে এবং তার সত্যিকার অনুভূতি ফুটিয়ে তোলা একান্ত অসম্ভব। কেবল যারা গিয়েছেন তারাই বুঝতে পারবেন এর আনন্দ ও অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা কতোটুকু। বিশ্বজনীন এবং সমগ্র মানব জাতি–গোষ্ঠির লোকের সঙ্গে ঈদ করতে পারা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এর থেকে নিজস্ব অভিজ্ঞতা এটুকুই যে, মনের একান্ত আকুতি ও আগ্রহ থাকলে তা যে কারো জন্যেই সম্ভব।

ষোল. ঈদের আরেক আনন্দময় অভিজ্ঞতা হলো, অফিস খুললে দুই একদিন প্রায় কাজ শূন্য থাকা এবং ফাকা রাস্তায় দ্রুত বাসায় আসতে পারা। প্রথম দিন যদিও অনেক অফিসেই লোক যায় না তবুও আমাদের ব্যাংকের একটি প্রচলিত প্রথার কারণে অনেকেই আসে। কারণ সেদিন অফিসের বস সকলের সঙ্গেই কোলাকুলি করেন, তার সঙ্গে মিষ্টি বিতরণও। কর্মজীবনের আনন্দময় স্মৃতি প্রাপ্তির অংশে এর ভাগ নিঃসন্দেহে বেশ বড়।

ল্যাবরেটরি রোড, ঢাকা থেকে

কবুতর

– মহল

গ্রামের বাড়িতে এসে অলস সময়গুলো আর কাটতে চায় না। বাজারে যাদের নিয়ে সময় কাটাই তাদের অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগত এবং দলীয় কোন্দল আছে। আছে গ্রামের অশিক্ষিত মাতব্বর এবং নোংরা রাজনীতি। অনুভব করলাম এদের থেকে নিজেকে এই মুহূর্তে না সরালে বড় কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো। অথচ চা, সিগারেট পুড়িয়েও সময় যে কাটে না!

বাড়ির পাশেই ছিল তার বাড়ি। মৌচাকে মধু জমেছে। মধুর যন্ত্রণায় দিশেহারা ভোরের শাপলা। নৌকা ভাসিয়ে কাছে যাও, হাত বাড়িয়ে ছিড়ে আনো, ব্যস। স্থির করলাম কয়েকদিনের জন্য অলস সময়টা এখানেই কাটাই। কয়েকদিনের চেষ্টায় তার মায়াবী চোখ অনেক চোখ ফাকি দিয়ে আমার চোখের সমান্তরালে মিশে যায়। চোখে চোখ রাখা আর হাতে হাত রাখা যে অনেক ব্যবধান তা বুঝলাম অনেক চেষ্টার পরও যখন তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের করতে পারলাম না। সামনাসামনি পড়লে সে যেন অন্য মানবী। নিরাশ হয়ে যখন ভাবি, নিজেকে গুটিয়ে নেবো তখনকার মায়াবী চোখ, রাগ, ক্ষোভ এলোমেলো করে দেয়।

চোখে চোখ রেখে আর দূর থেকে মোহিনী হাসিতে আমার মন ভরছিল না। যার মধুর নেশা সে কি ফুলের সৌরভে তৃপ্ত হয়? আর ভাবখানা ছিল এমন, পারলে পেট ভরে খাও, না হলে উপোস করো, নিজে হাতে এক কণাও দেবো না। ভাবছিলাম যে কয়টা দিন খরচ করলাম তার পাওনা কি করে উসুল করা যায়।

চোখের কিছু আশ্বাস, মুখের না বলা কথা কিছু আশা, কিছুটা অনিশ্চয়তা। হয় এসপার নয় ওসপার। তার ঘরে পাশে গিয়ে হাত ধরে টেনে আনি। বন্ধ চোখ দুটি যে কোনো ঝড় জলোচ্ছ্বাসের জন্য তৈরি। বুকের মধ্যে

যখন টেনে আনি তখন দেখি, সেই চেনা প্রতিদিনের ডানপিটে মেয়েটি নয়, এ যেন এক শান্ত-নিঝুম কবুতর, ভালোবাসার কাদা-মাটির সঙ্গে লেপ্টে আছে। ঠোট দুখানা কি পুষ্ট এবং মিষ্টি! তার তুলতুলে নরম দেহটা বুকের মধ্যে যখন চেপে ধরেছি তখন মনে হলো, তার শরীরে কোনো হাড় নেই। ভালোবাসা পেলে মেয়েরা এমন মোমের মতো গলে যায়। ভীষণ অবাক লাগে।

এবাবে শিয়ালের মতো ওৎ পেতে থেকে কমলার রস খাও তা যতো মিষ্টিই হোক, আমার পোষাবে না। তারচেয়ে বাজারে বসে চা, সিগারেটের সঙ্গে আড্ডা দেয়া অনেক সহজ। তার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সময় করে তাকে বুকের মধ্যে আর নেয়া হয়নি। মাঝে মধ্যে ভাবি, সব মেয়েই কি বুকের মধ্যে এমন গলে যায়। কবুতরের মতো চুপটি করে থাকে?

ওয়েস্টার্ন পাড়া, ভোলা থেকে

সার্বজনীন

– মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

আশির দশকের শেষের দিক। তখন আমি জার্মানিতে ছিলাম। জার্মানিতে যাওয়ার পর কয়েকটা শহর ঘুরে ফ্রাইকের্গ নামের নাতিদীর্ঘ শহরে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি পেলাম। এখানে আসা প্রায় সাত আট মাস হয়ে গেছে।

জার্মানির প্রত্যেক শহরে একটা প্রধান সড়ক আছে। এ সড়কের দুপাশে এ দেশের সব নামকরা দোকানগুলো দাড়িয়ে থাকে। এক কথায় যাকে শহরের প্রাণ কেন্দ্র বলে। শহরের লোকেরা বিশেষ কোনো কেনাকাটা বা অবসরে ঘোরাফেরার জন্য সেখানে আসে। বিশেষ করে শনিবারে তিল ধারনের ঠাই থাকে না।

আমি সেই শহরের প্রাণ কেন্দ্র থেকে দুই তিন কিলোমিটার পশ্চিমে থাকতাম। প্রথম প্রথম সকাল দশটা কি এগারোটা অথবা সন্ধ্যা সাতটা কি আটটার দিকে কোনো করণে বাসা থেকে রাস্তায় বের হলে মাঝে মধ্যে একজন ষাটঊর্ধ বয়সের বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হতো। সেই লোকটা ছিলেন জন্মগতভাবে নিম্নাঙ্গ বিকল কিন্তু ঊর্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি তিন চাকার বিশেষভাবে তৈরি একটা গাড়ি নিজ হাতে চালিয়ে এ সময় আমার বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করতেন। সব সময় মাথায় ক্যাপ আর চোখে ভারী লেন্সের চশমা।

একদিন শহরের প্রাণ কেন্দ্রে গিয়ে দেখি, লোকটা তার গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে সামনে একটা টেবিলে কতোকগুলো পুরনো বই সাজিয়ে বসে আছেন। এই অবস্থায় তাকে দেখে বুঝতে পারলাম, কেন তিনি সকাল এবং সন্ধ্যায় আমার বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন।

আর একদিন সন্ধ্যায় কি কারণে যেন রাস্তায় বের হয়ে দেখি সেই বৃদ্ধ তার গাড়ি নিজে চালিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে তিনি হাসি মাখা বদনে *গুটেন আবেন* (জার্মান ভাষা) যার বাংলা অর্থ হলো শুভ সন্ধ্যা বলে আমাকে সালাম দিলেন।

আমিও শুভ সন্ধ্যা (গুটেন আবেন) বলে প্রতিউত্তর দিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখি, লোকটা যেন আমাকে কিছু বলতে চান। কিন্তু আমি বিদেশি বা অপরিচিত হওয়াতে আমার সঙ্গে সহজ হতে পারছেন না। তখনো আমি তেমন জার্মান ভাষা বলতে পারি না। তবুও তাকে আমার সঙ্গে সহজ হওয়ার জন্য নিজ থেকে ভাঙা ভাঙা জার্মানিতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আমাকে চেনেন?

আমতা আমতা করে বললেন, না। তবে মাঝে মধ্যে তোমাকে রাস্তায় দেখি। তারপর অনর্গল তার ভাষায় বলে যেতে লাগলেন। আমি সব কথা বুঝছি না দেখে এক সময় নিজ থেকেই থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ থেমে থেকে যাতে আমি বুঝতে পারি সেভাবে আবার নিজ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি?

নাম বললাম।

নিজ থেকে তিনি বললেন, তার নাম বেনা।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দেশ কোথায়?

বাংলাদেশ।

বয়স কতো?

তেইশ।

এ শহরে কতোদিন ধরে আছো?

দুই মাস।

থাকো কোথায়?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, ওইখানে।

এবার তিনি বুঝতে পারলেন জার্মানিতে আমি নতুন। তাই তার সব কথা বুঝতে পারিনি। আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আচ্ছা, আমি খুব ক্ষুধার্ত। এ জন্য তোমার সঙ্গে আর বেশি কথা বলতে পারছি না। পরে দেখা হবে বলে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন পর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে তার দোকানের পাশ দিয়ে হেটে যেতেই দেখি সেই আগের দিনের মতো আমার দিকে তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাই বাধ্য হয়ে তার পাশে দাড়াতেই হাসি মুখে প্রথমেই বললেন, তুমি খুব সুন্দর যুবক।

ভ্যাবাচেকা খেয়ে বললাম, তাই নাকি?

এবার আরো জোর দিয়ে বললেন, অবশ্যই। তারপর আরো বললেন, তোমাকে যেদিন প্রথম আমি লক্ষ্য করেছি সেদিনই মনে মনে ভেবেছি এতো সুন্দর যুবক, তারপর অন্যদিনগুলো যখন দেখেছি তখন ভেবেছি এই সুন্দর যুবক একা একা এ শহরে কি করে! আগেও কোনোদিন তাকে দেখিনি। তাই তোমার সম্পর্কে জানতে সেদিন নিজ থেকে সালাম দিয়েছিলাম।

নারী নই তবুও কিছুটা লজ্জাবনত কণ্ঠে বললাম, বেশ তো, কি জানতে চান বলুন? তারপর অনেকক্ষণ তার কথার জবাব জার্মান এবং দেহের অঙ্গভঙ্গির ভাষায় যতোটুকু পারলাম ততোটুকু দিয়ে সেদিনের মতো চলে এলাম।

এরপর শহরে গেলেই তার সঙ্গে দেখা করা চাই। যদি কোনো কারণে বেশ কিছুদিন দেখা না হয় তাহলে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবেন, এতোদিন কোথায় ছিলাম। কি কারণে এদিকে আসি না, ইত্যাদি।

বুঝলাম, আমি যদি তার সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে সময় দিই তাহলে তিনি খুশি হন। তাই পরে চেষ্টা করতাম তার সঙ্গে দেখা করতে।

আস্তে আস্তে বৃদ্ধের সম্বন্ধে যা জানতে পারলাম তা হলো, প্রতি রবিবার ছাড়া বাকি দিন সকাল এগারোটা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সমাজ কল্যাণ দফতর থেকে একটা লোক এসে তার দোকানের টেবিলে বই সাজিয়ে দিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় দোকান গুটিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যায়।

লোকেরা বাড়িতে পড়ে থাকা পুরনো বই তার কাছে বিক্রি করে এবং তিনি সেগুলো অন্যের কাছে বিক্রি করেন অথবা ভাড়ায় লোকেরা পড়তে নেয়। এখানে বলে রাখা ভালো, অধিকাংশ লোক তাকে এমনিতেই বই দিয়ে যায়। যদিও তিনি সেগুলোর মূল্য পরিশোধ করতে চেষ্টা করেন। এবং যারা বই কেনে বা ভাড়ায় নেয় সবাই নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি দিতেই চেষ্টা করে। কেন? আশা করি, কারণটা সবার জানা। কিন্তু তিনি কারো দয়ায় বেচে থাকতে পছন্দ করেন না।

একদিন তাকে কথা প্রসঙ্গে বললাম, আপনার এতো কষ্ট করার দরকার কি? চাইলে সমাজ কল্যাণ দফতরই আপনার সব চাওয়া-পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

বেনা দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে না সূচক জবাব দিলেন। জার্মানির এই পঙ্গু লোকটাও সরকারের সাহায্যে বেচে থাকা অপমান বোধ করেন। অথচ আমরা সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করতে পেরে গর্ববোধ করি।

যাহোক। আরেকদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বাসায় ঠিকানা দিয়ে বললেন, যে কোনো রবিবার যেন আমি তার বাসায় বেড়াতে যাই।

ঠিকানা দেখে বুঝলাম আমার বাসা থেকে তার বাসা আরো দুই তিন কিলোমিটার দূরে।

কথামতো একদিন তার বাড়িতে গিয়ে আমি উপস্থিত। আমাকে দেখে তিনি ভীষণ খুশি। তবে সেটা একটা পুরনো এবং পরিত্যক্ত বাড়ি। চারদিকে গাছগাছালি দেখে মনে হয় ভুতুড়ে বাড়ি। ঘুরে ফিরে দেখে বুঝতে পারলাম এখানে একদিন কোনো সুখী পরিবারের বাস ছিল। কৌতূহল নিবারণ করতে না পেরে বেনা-কে আমার মনের ধারণার কথা বললাম।

তিনি বললেন, হ্যা, তোমার ধারণা সত্য। কিন্তু এখানে আগে এক পরিবারের বাস ছিল। সে পরিবারে পরে যতো সন্তান জন্ম নিতো সবই হতো বোকা। এবং নির্বোধ। এতে করে সে বংশ নির্বংশ হয়ে যায়। জার্মানিতে নাকি এমন করে অনেক বংশ নির্বংশ হয়ে যায়। তারপর সমাজ কল্যাণ দফতর আমাকে এই বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। সেই থেকে আজ ত্রিশ বছর ধরে আমি এখানে বাস করি।

পরে সময় পেলে রবিবারে তার বাসায় যেতাম। তার সঙ্গে এক জার্মান যুবক থাকে। সে ছেলেটার বাপ-মায়ের ছোটবেলায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সরকারিভাবে লালিত পালিত হয়ে বর্তমানে এখানে থাকে। দুজনেই খৃস্টধর্মে ঘোর বিশ্বাসী। তাই যুবকটা এই বৃদ্ধকে দেখাশোনা করাই জীবনের ব্রত হিসেবে ধরে নিয়েছে। বৃদ্ধের বাড়িতে আধুনিকতার কোনো ছোয়া নেই। কেন নেই জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারলাম তিনি একজন পরিবেশবাদী।

তখন আমি ভালো জার্মান ভাষা শিখে ফেলেছি। বেনার বাসায় গেলে অনেক কথা আলাপ হয়। যেমন তার এক বোন আছে। সে অস্ট্রিয়ান একজনকে বিয়ে করে বর্তমানে সেখানেই থাকে। বছরে একবার এসে তাকে দেখে যায়। দুই ভাইও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অভাবের তাড়নায় আমেরিকা চলে গেছে। শত কষ্ট ভোগ করেও তার মা তাকে বুকে আগলে রেখেছিলেন। মা মারা যাওয়ার পরে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছেন। তার বাবার প্রসঙ্গে বলতে একদম নারাজ। কারণ পরে তার মাকে ছেড়ে বাবা অন্য মহিলাকে নিয়ে থাকতেন।

বিশ্বযুদ্ধের পরের কাহিনী বলতে গিয়ে একদিন তিনি বললেন, যাদের সামর্থ ছিল তারা যে আলুর খোসা ছাড়িয়ে ফেলে দিতো তা গরিবজন এনে সিদ্ধ করে পানিটুকু খেতো। প্রতিদিন সুস্থ প্রত্যেক নরনারীকে দশ বারো ঘণ্টা কাজ করতে হতো। বাড়ি ফেরার পথে সরকার মাত্র দশ বারো মার্ক হাতে ধরিয়ে দিতো।

বললাম, তাতে তারা প্রতিবাদ করতো না?

বেনা প্রতিবাদী সুরে বললেন কেন? সরকার তখন এর বেশি দেবে কোথেকে!

তখন মনে মনে ভাবলাম, আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন পেশাজীবী প্রতিনিধি দল প্রয়াত শেখ মজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করতে লাগলো যার মূল দাবি ছিল অর্থ দাও। তখন তিনি রাগে, ক্ষোভে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তিন বছর আমি কাউকে কিছু দিতে পারবো না। আরো কতো কি।

তার সঙ্গে আলাপ করে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের দেশের জনগণের মনোভাব এবং স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের জনগণের মনোভাবের বিপরীত চিত্র। তবুও তার কাছে আমার দেশের ভালো দিকটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করতাম। কারণ দেশ এবং দেশের জনগণের খারাপ বলে লাভ কি? শত হলেও সে যে আমার জন্মভূমি।

এ কারণে একদিন তিনি আমাকে বললেন, আচ্ছা তাহলে তোমার দেশ এতো গরিব কেন?

তাকে ভালো ধারণা দিতে উদাহরণ হিসেবে বললাম, যেমন ধরো, তোমার দেশে এক শতাংশে আলু উৎপাদিত হয় দশ কিলো। বিপরীতে আমাদের দেশে উৎপাদিত হয় ত্রিশ কিলো। কিন্তু হলে কি হবে, দশ কিলোর চাহিদা পাচজনের এবং ত্রিশ কিলোর চাহিদা পঞ্চাশজনের। তাছাড়া বন্যা, খরা, সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো লেগেই আছে। এছাড়া আর কি বলি বলুন!

তারপর আরো বেশ কয়েক বছর চলে গেল। জার্মানিতে আর থাকা যাবে না। আমাকে হয় দেশে চলে যেতে হবে, না হলে অন্য দেশে চলে যেতে হবে। মনস্থ করলাম ফ্রান্সে চলে যাবো।

বৃদ্ধকে আমার মনের কথা বললাম। তার দেশের আইনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। কাজেই অন্য কিছু না বলে ভারাক্রান্ত মনে শুধু জানতে চাইলেন কিভাবে যাবো।

আমি সব খুলে বললাম। আমার চলে আসার প্রস্তুতির সময়ে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন তার বোনের মতো অন্তত বছরে একবার এসে তাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। এবং প্রতি বছর খৃস্টের জন্মদিনে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাই। ঠিকানা পেলে তিনিও কার্ড পাঠাবেন।

কিন্তু আমরা কিভাবে ইওরোপে অবস্থান করছি তা বৃদ্ধের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কাজেই তাকে বোঝাতে গেলে তিনি সব কথা বুঝবেন না। বরং না বুঝে হয়তো আমার প্রতি তার উল্টো ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই শুধু তাকে বললাম, সাধ্যমত চেষ্টা করবো তার কথা রাখতে। কিন্তু পরে তার কোনোটাই আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হয়নি। তাতে আমি অনুতপ্ত এবং সেই বৃদ্ধের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

শেষ বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। বিদায় নিতে বেনার বাড়ি গেলাম। তিনি আমাকে সাধ্যমতো চলার পথের উপদেশ দিলেন।

কিন্তু আসার পথে যখন আমি তাকে শেষ সালাম দিলাম তখন তিনি আমার দিকে চেয়ে শেষ সালামের উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তার দুগাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমিও তা দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমার তখন মনে হলো, সেই বৃদ্ধের আমার প্রতি তার এতোদিনের ভালোবাসার বেদনা–বিরহের বাধ ভেঙে দুগাল বেয়ে গড়িয়ে চলছে।

অনেকক্ষণ এভাবে আমি তার পাশে নীরবে দাড়িয়ে থেকে পৃথিবীর সব ভাষা হারিয়ে বৃদ্ধের চোখের সামনে থেকে তাকে আর কষ্ট দিতে না চেয়ে নীরবে এক পা, দুই পা করে হেটে চলে এলাম। রাস্তায় এসে মনে মনে ভাবলাম, জগতের মানুষের ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ভিন্ন হলে কি হবে, প্রেম, স্নেহ, মায়া, মমতা এক এবং অভিন্ন।

আরিন্দ্রা, ফ্রান্স থেকে

ফিরে এসো

– মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সুজন

দুই ভাই এক বোনের ছোট একটি পরিবার। বাবা পল্লি চিকিৎসক। মাও বেচে আছেন। ২০০০ সালে এইচএসসি পাস করে বিএসএস–এ ভর্তি হয়েছি পাবনা কলেজে। লেখাপড়া করে নিজেকে একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া স্বপ্ন। এর মধ্যে একমাত্র বোনের বিয়ের অফার এলো পাবনা থেকে। ছেলে ভালো, ভালো ব্যবসা করে। দুপক্ষের মতামতে বিশেষ শুভ দিনে সম্পন্ন হলো বিয়ে।

এর মাঝে আরেকটি কথা। আমাদের বাড়ি গ্রামে। গ্রামের একটি মেয়ের বিয়ে হলো শহরে। আত্মীয় সবাই ভালো। সবচেয়ে ভালো আমার বোনের ছোট ননদটি। মিষ্টি, ফর্শা মেয়েটি দেখতেও সুন্দর। ক্লাস টেন–এর ছাত্রী। নাম লিটা। বোনের বাসায় প্রথম বেড়াতে গেলাম। সবার সঙ্গে ভালো পরিচয় হলো। কথা হলো। সন্ধ্যায় লিটা আমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হলো। দুজনে পাশাপাশি হাটছি। আবেগময় দুটি মন। এক সময় লিটা আমার হাত ধরলো। রাস্তায় লোকজন আছে বলে আমি তাকে হাত ছেড়ে দিতে বললাম।

উত্তরে লিটা বললো, যদি কোনোদিন না ছাড়ি?

বললাম, পারবে গ্রামের একটি ছেলেকে শহরের মেয়ে হয়ে চিরদিন ধরে রাখতে?

সে বললো, আমি আপনাকে ভালোবাসি।

আমিও দেরি না করে জানিয়ে দিলাম, লিটা, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

তারপর থেকেই শুরু। উল্লেখ্য যে, আমার বোনের বিয়ে হয় ২০০১ সালে।

একটি বছর আমাদের ভালোবাসা চলতে লাগলো আপন গতিতে। এর মধ্যে কতো স্মৃতি, কতো কথা, রাগ, অভিমান দুজনার প্রেমকে করেছে আরো সুন্দর, আবেগময়। লিটাকে না দেখে একটি দিনও থাকতে পারতাম না। তার রাঙা দুটি ঠোটে পরশ না দেয়া পর্যন্ত আমার মন শান্ত হতো না।

লিটা একদিন আমাকে বললো, একটা কিছু করো, না হলে আমার বিয়ে হয়ে যাবে।

বললাম, কি করবো।

সে বললো, পুলিশে চাকরি নাও। আমার পুলিশ খুব পছন্দ।

বললাম, চাকরি কি চাইলেই পাওয়া যায়?

সে বললো, চেষ্টা করতে কোনো আপত্তি আছে?

বললাম, তোমাকে পাবার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি।

তারপর এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। ২০০২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি। পাবনা পুলিশ লাইন মাঠে পুলিশে লোক নেবে। পৃপারেশন নিয়ে দাড়ালাম। আল্লাহর রহমতে চাকরি হয়ে গেল। এবার ভাবলাম দুজনার আশা এবার পূর্ণ হবে। চাকরি হওয়ার পর তার সঙ্গে দেখা করে বাড়িতে চলে আসি। মাঝখানে আর দেখা হয়ে ওঠেনি।

২০০২ সালের ১১ মার্চ ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্য বাড়ি থেকে পাবনা রওনা হই। সকালে রওনা হলাম। উদ্দেশ্য লিটার সঙ্গে বসে একটু বেশি সময় কথা বলবো। ট্রেনিংয়ের ছয় মাস তো আর দেখা হবে না। চলে এলাম বোনের বাসায়।

এসে যা শুনলাম তাতে হতবাক হয়ে গেলাম। মাত্র তিন দিন আগে তাদের বাসায় ভাড়া থাকা একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। আমাকে ভুলে গেছে। মুছে ফেলেছে আমার ভালোবাসা তার হৃদয় থেকে।

দুঃখ ভারাক্রান্ত মনটাকে নিয়ে ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে চলে গেলাম রংপুরে। ছয় মাস ট্রেনিং শেষ করলাম। বর্তমানে আমি কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে কর্মরত। গত ২২ আগস্ট ২০০৩-এ আমার বোনের মেয়ে হয়েছে। দেখতে গেলাম। শুনলাম লিটা খুব কষ্টে আছে। তার স্বামী তাকে মারধর করে। সে খুব কান্নাকাটি করে এখন। শুনে খুব কষ্ট পেলাম। কারণ তার জন্য এখনো আমার ভালোবাসা শেষ হয়নি। হয়তো মনের অজান্তেই বলে উঠি, লিটা, ফিরে এসো। সব গ্লানি মুছে দিয়ে আমি আবার নতুন করে জীবন গড়ে তুলবো। আমি এখনো তোমার জন্য কাদি। আবার তুমি ফিরে এসো সেই প্রথম সকালের মতো। আমি তোমাকে শুভ্র শিশিরের মতো পবিত্র মনে করে ঘরে তুলে নেবো। ফিরে এসো লিটা, ফিরে এসো।

পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া থেকে

প্রিয় দুই মুখ

– ড. মঈনুল মহম্মদ আহসান

যে চারাগাছটা মাত্র মাটি ফুড়ে বের হলো তার শক্ত, সামর্থ হয়ে মাটিতে গেড়ে বসার জন্য প্রয়োজন হয় সময়ের। সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে একবার দাড়াতে পারলে তার স্থায়িত্ব হয় সাধারণত দীর্ঘ। মানুষের স্মৃতিও বোধ করি তেমনি। বেশির ভাগ ঘটনাই মনে পড়ে না খুব একটা। কিন্তু কিছু ঘটনা আছে যা স্মৃতিতে যেন

পরিপুষ্ট হতে থাকে প্রতিদিন। আমার ছেলেবেলার তেমনি দুটি স্মৃতি এখন ডালপালা মেলে যেন মহীরুহ হয়ে উঠেছে আমার অন্তরের আঙ্গিনায়।

এক.

সময়টা ১৯৭২ বা ১৯৭৩ সাল। ফুরফুরে ঈদের সকাল। আর সব ঈদের মতোই আব্বার হাত ধরে নামাজ সেরে ফিরেছি একটু আগে। ডাইনিং টেবিল জুড়ে সাজানো হরেক রকমের মিষ্টান্ন। আব্বা তাড়া দিলেন কিছু মুখে দিয়ে আবার তার সঙ্গে বের হওয়ার জন্য। তাড়া খেয়ে খুশি হলাম, বুঝলাম বেড়াতে যাওয়া হবে এখন। ঈদের দিন কে না বেড়াতে চায়!

আমরা তখন সোবহানবাগে ফার্স্ট ক্লাস সরকারি কর্মকর্তাদের কলোনির বাসিন্দা। ধানমন্ডির বিখ্যাত ৩২ নাম্বার রোডের উল্টো দিকের ওই কলোনিতে তখন ছিল মোট সাতটি বিল্ডিং। প্রতি বিল্ডিংয়ে আটটি করে সর্বমোট ছাপ্পান্নটি ফ্ল্যাটে বাস করতেন কর্মকর্তাদের ছাপ্পান্নটি পরিবার। সমগোত্রীয় বলেই বোধ করি সবার মধ্যে ছিল দারুণ সখ্য।

আমরা থাকতাম চার নাম্বার বিল্ডিংয়ে। কলোনিতে ঢোকার প্রধান দুটো গেটের একটার পাশ ঘেষে ছিল বিল্ডিংটা। আব্বার হাত ধরে বিল্ডিংয়ের গাড়ি বারান্দায় এসেছি, পা রাখবো রাস্তায়। অথচ হাতটা টেনে ধরে আটকালেন আব্বা।

ডানে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মেইন গেট দিয়ে এগিয়ে আসছে বিশাল এক কালো মার্সিডিজ। আমাদের চার চোখ তখন ওই গাড়ির দিকে। ওটা চলে গেলেই রাস্তায় নামবো। ধীরে ধীরে গাড়িটা এসে পড়েছে আমাদের সামনে। বোধ করি আমাদেরকে দেখে আরেকটু যেন থেমে এলো গাড়িটার গতি। দেখলাম ড্রাইভারের ঠিক পেছনে বাম হাতে মুখে পাইপ ধরে আব্বার দিকে তাকিয়ে ডান হাতটা নাড়ছেন স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান। জানতাম সাত নাম্বার বিল্ডিংয়ে তার এক কাছের আত্মীয় থাকেন, সম্ভবত সেখানেই এসেছিলেন শেখ মুজিব।

হৃদয়ের জমিনে পুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠা সেই স্মৃতির মহীরুহ নাড়া দিলে এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই স্মিত হাসি ভরা পবিত্র এক মুখ, আমাদের স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবর রহমানের সেই মুখ।

দুই.

কয়েক বছর পরের ঘটনা। আবার এক ঝকঝকে ঈদের সকাল। আবারও আব্বার সঙ্গে আমি। বসে আছি ঢাকা আউটার স্টেডিয়ামের বিশাল শামিয়ানার নিচে। ঈদের প্রধান জামায়াতের একেবারে সামনের দিকে। নামাজের নির্ধারিত সময়ের সামান্য বাকি। সবাই অপেক্ষায় প্রধান ব্যক্তিত্বের। হঠাৎ দেখি মুসল্লিদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছেন একহারা গড়নের হাস্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ এক সুপুরুষ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান। পবিত্র ঈদের দিনের সমস্ত নির্মল সৌন্দর্য আর আনন্দ যেন ঠিকরে বের হচ্ছিল তার উদ্ভাসিত চেহারায়। আজ এতোকাল পরেও সেই স্মৃতি এখনো পল্লবিত আমার অন্তরে।

আমি এখন প্রবাসে। ঈদ করেছি, নামাজ পড়েছি বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশেও গেছি বেশ কয়েকবার সবার সঙ্গে ঈদ করতে। প্রতিবারই সেই ছোটবেলার মতো ভোরবেলাতেই ছুটে গেছি প্রথম জামায়াতের নামাজ ধরতে, অবশ্য আব্বাকে ছাড়া। আমার অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা তার ভারী স্থূল দেহ নিয়ে আর যেতে পারেন না কোনো ঈদের নামাজে। আমিও হতে পারি না তার সঙ্গী আর। কিন্তু প্রতিটা ঈদের ভোরে আমার বাম হাতের কবজিতে অনুভব করি আমার বাবার সেই নিশ্চিত নিরাপত্তার শক্ত হাত। এবং চোখের তারায় ভাসে ভালোবাসায় পূর্ণ, প্রশান্ত সেই দুটি মুখ, দুই প্রিয় মুখ।

নেতৃত্বের এতো সুন্দর দুটি মুখ আমি আর কখনো কোথায়ও দেখিনি।

লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে

ধান্ধাবাজি

– সাইফ বরকতুল্লাহ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে জামালপুর থেকে ঢাকায় তিস্তা এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেনে শোভন স্লিপারে বসে আসছিলাম। রাত প্রায় দুইটা পয়তাল্লিশ মিনিটে জামালপুর থেকে ঢাকায় ছেড়ে আসা ট্রেনটিতে প্রায় প্রতিদিন সাত–আটশ মানুষ যাতায়াত করে। ময়মনসিংহ স্টেশনে আসার পর ট্রেনটি পাচ মিনিট অপেক্ষা করে।

ময়মনসিংহ থেকে ছাড়ার সময় আমি যে বগিতে ছিলাম (ছ–এক, দুই) সে বগিতে আরো দশ বারোজন নতুন যাত্রী ওঠে। এদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা যাত্রী ছিল। ওই ট্রেনে কর্মরত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এক বোরখা পরিহিত ভদ্রমহিলাকে আমার পাশের সিটে (সিট নাম্বার : সাত, আট) বসিয়ে দিলেন।

রাতের জার্নি। যাত্রীদের অনেকেরই চোখে ঘুমছিল এবং অনেকেই উপন্যাস পড়ছিলেন। আর আমি জানালার বাইরে চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দ রাতের সঙ্গে মিতালি করছিলাম।

মহিলাটি যখন ট্রেনে উঠেছিল তখন তার হাতে একটি পত্রিকা ছিল। কিন্তু সে ট্রেনে উঠেছিল টিকেট ছাড়া। সিটগুলো ছিল মুখোমুখি। মহিলার পাশে বসা ছিল এক স্মার্ট তরুণ। মহিলাটি বসেই তরুণকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কোথায় যাবেন।

তরুণ সহযাত্রী হিসেবে সহজভাবেই উত্তর দিল, ঢাকায় যাবো।

তরুণটি গল্পচ্ছলে ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করলো, আপনি কি করেন?

মহিলাটি উত্তর দিল, আমি চাকরি করি এবং গফরগাও যাচ্ছি। এভাবে আলাপচারিতার ফাকে ফাকে মহিলাটি ঘুমের ভান করে তরুণের ওপর হেলে পড়ছিল।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি তাদের এই কাণ্ডকারখানা। এয়ারপোর্ট পার হওয়ার পর ওই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ওই মহিলার কাছে ভাড়া চাইলে মহিলাটি ইশারায় তরুণকে দেখিয়ে দেয়।

ওই কর্মকর্তা তখন তরুণের কাছে ভাড়া চায়।

তখন তরুণ বলে, কিসের ভাড়া চান? আমি তো টিকিট করেছি।

কর্মকর্তা বলে, মহিলার ভাড়া।

তরুণ তখন তো হতবাক। এক পর্যায়ে তর্ক লেগে যায়। মুখোমুখি বসা আরেকটি মহিলা তখন ওই বোরখা পরা মহিলার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

আমরা আশপাশের যাত্রীরা তখন ঘটনাটি আরো খোলাখুলিভাবে জানলাম তৃতীয় শ্রেণীর আরেক কর্মকর্তার কাছে। তিনি বললেন, ওই বোরখা পরিহিত মহিলাটি প্রতিনিয়ত এ রকম ধান্ধা করে। প্রতিদিন কোনো না কোনো যাত্রীর পাশে বসে তাকে বশ করানোর চেষ্টা করে। আর ভাড়া দিতে না চাইলে ট্রেনে কর্মরত জিআরপি পুলিশের কাছে বিচার দেয় যে, তরুণটি আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছে। পুলিশ তখন তাকে ধরে নিয়ে সব কিছু রেখে দেয়।

এভাবে নিয়মিত ঘটছে বোরখা পরিহিত মহিলার ধান্ধাবাজি। তারা শুধুই ধান্ধাবাজি নয়, শেষে পুরুষকে নির্যাতনও করে বটে। সুতরাং যে কোনো জার্নির সময় এই সব মহিলা থেকে সাবধান।

ঢাকা থেকে

প্রাণের পরশ

– ডালিয়া নিলুফার

আমার আদরের মা সময় মতো উপহার কিনে রেখে আমাদের জন্মদিনে দারুণভাবে চমৎকৃত করতেন। কি করে মা বুঝতে পারতেন আমি কি চাই সেই বছরে তা আজও বোধগম্য নয়। সেই মা হঠাৎই আমাদের ছেড়ে চলে যান। তারপরই প্রবাসে আমাকে আবারও যেতে হয় স্বামীর চাকরির কারণে জার্মানির রাজধানী বন–এ।

মার্চ মাসের সকাল। আকাশ সেদিন ছিল চিরাচরিত ইওরোপিয়ান আবহাওয়ারই মতো। মন খারাপ করে দেয়া মেঘলা আকাশ। সূর্যের কোনো টিকি দেখা যাচ্ছে না। সারি বাধা গাছগুলো যেন সব আমারই মতো নিঃসঙ্গ। কর্তা অফিসে, ছেলেমেয়ে স্কুলে। জন্মদিনে বাড়িতে একা বসে মায়ের অভাব দারুণভাবে অনুভব করছি। বাবা–মায়ের স্মৃতি কেন এতো সুমধুর! ফ্যাকাশে আকাশ আমার চোখের পানিতে আরো ঝাপসা হয়ে আসছিল। মনটাকে প্রবোধ দেয়ার জন্য শোনা গানই বার বার শুনছিলাম। পরিষ্কার টেবিলও আবার ঝেড়েমুছে রাখছিলাম। এমন সময় দরজায় ঘণ্টা ধ্বনি।

নির্ঘাত চার্চের তবলিগি লোক ধর্মের মাহাত্ম বোঝাতে এসেছেন মনে করে দরজা খুলে দেখি florist (ফ্লোরিস্ট বা ফুল বিক্রেতা)–এর গাড়ির সামনে জার্মান যুবক বিরাট ফুলের তোড়া নিয়ে দাড়িয়ে।

চোখ কপালে তুলে কার্ডটা পড়ে মুখ আমার হা হয়ে গেল।

একমাত্র ছোট ভাই সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে জন্মদিনের মুঠো মুঠো শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে সুন্দর এই তোড়ার মাধ্যমে! বিদেশে ফুলের তোড়া প্রাপ্তি অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিদেশিরা আমাদের বাসায় ডিনারে আমন্ত্রিত হলে পরদিন নিজে বা ড্রাইভারের মারফতে ফুল আর ধন্যবাদের চিরকুট পাঠানো অবধারিত। খুশি হলেও ভাবতাম এ হচ্ছে তাদের সামাজিক ভব্যতার এক গতানুগতিক দিক। কিন্তু মায়ের অবর্তমানে ভাইয়ের পাঠানো ফুল পেয়ে খুশির অশ্রু জলে ভারাক্রান্ত মন হালকা হলো এবং ছেয়ে গেল স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে।

২০০০ সালের জুন মাসে ঢাকায় এসেছি দুই মাসের জন্য স্বামীর সঙ্গে। ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়ছে। তাই তাদের অভাব নানানভাবে উপলব্ধি করি, বিশেষ করে ভালো–মন্দ রান্না করলে। স্বামীর জন্মদিন। ভাবলাম এই গরমে ঘন ঘন বিদ্যুৎ প্রস্থান, এই যানজটে কিছু করাই মুশকিল। ভাবলাম নিজেই ইমপ্রুভড ডায়েট (মায়ের ভাষায় বিশেষ কিছু রান্না করা)–এর ব্যবস্থা করে ফটো তুলে ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করবো।

দুপুরে দরজায় বেল। নিশ্চয়ই চাদাবাজরা ভুলক্রমে আমাদের শাসালো মক্কেল ভেবে এসেছে আতংকে দরজা খুলে দেখি কেক হাতে ভদ্রলোক! সত্যি এবারে চোখ *চড়কগাছ*। হাতে নিয়ে দেখি ছেলে আমার সুদূর ডালাস থেকে বাবার জন্মদিনের উপহার পাঠিয়েছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

বেশ রাতে আবারও শুনি কলিংবেল। এবারে ভাবলাম ডাকাতির আলামত কিনা। দোয়া–দরুদ পড়তে পড়তে দরজা খুলে দেখি মেয়ের বান্ধবী রজনীগন্ধার ঝাড় আর এক ঝুড়ি ফল নিয়ে হাজির।

কি ব্যাপার? আমার মেয়ে লন্ডন থেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিছু পাঠাতে পারেনি বলে বান্ধবীকে ফোন করে এসওএস ফরমায়েশ দিয়েছে যেন মেয়ের হয়ে এই উপহার বাবাকে পৌছে দেয়।

ঢাকার ফোন প্রায়ই খারাপ থাকে। পার্সেলে কিছু পাঠালে হাতে আসে না। এমনকি ডাকে কার্ড–ফটোও গায়েব হয়ে যায়। তাই বেচারির শেষমেশ এই চেষ্টা!

এ যান্ত্রিক যুগেও এই প্রাণের পরশ সত্যিই সুখকর! আমার স্বামী এতো খুশি হয়েছিল যে, ফুলের তোড়া, ফলের ঝুড়ি ও কেক পরিবেষ্টিত হয়ে ফটো তুলতে রাজি হলো নির্দ্বিধায়, হৃষ্টচিত্তে। পৃথিবী জুড়ে অশান্তি, হানাহানি ও হতাশার মাঝেও এ ছোট ছোট প্রাপ্তি ও আনন্দগুলোই যেন বেচে থাকতে সাহায্য করে।

অস্ট্রেলিয়া থেকে

উপলব্ধি

একজন সেনা অফিসার হবার সুবাদে আমার বাবার মৃত্যু সংবাদটি পাই পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দুর্গম ক্যাম্পে বসে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে। সেখানে চিৎকার করে কাদলেও কোনো উপায় নেই যে সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবার কাছে যেতে পারবো। সেদিন আমার নিঃসঙ্গ কান্নার সঙ্গী হয়েছিল চাদনী রাত আর দুর্গম পাহাড়গুলো। যাহোক, ঢাকায় পৌছে জানলাম আমার বাবা চিকিৎসার্থে ইনডিয়া যাওয়ার পর তার স্ট্রোক হয়। সে সুযোগে বাবাকে কিডনি দেয়ার জন্য যে বাংলাদেশি ছেলেটি বাবার সঙ্গে গিয়েছিল সে বাবার সমুদয় অর্থ চুরি করে পালিয়ে যায়। আমার বাবা যিনি একজন সাবেক সেনা অফিসার, যিনি সারা জীবন মাথা উচু করে চলেছেন, যিনি পদোন্নতিতে পিছিয়ে পড়ার কারণে চাকরিই ছেড়ে দিলেন, যিনি সারা জীবন অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেননি তিনি সম্ভবত এতো বড় পরাজয়ের কষ্টটা আর সহ্য করতে পারেননি।

একটা মানুষ কতোটা অমানুষ হলে একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে এভাবে ফেলে পালিয়ে যায়। যে অমানুষটিকে গত দুমাস আমার মা তিনবেলা খাওয়া বেড়ে দিতেন, যে অমানুষটাকে বিদেশ যাবার প্রাক্কালে বেশ কিছু টাকার অগ্রিম দেয়া হলো তার পরিবারের কল্যাণের জন্য সেই অমানুষটির বাড়ি দুই জায়গায়। একটি কুষ্টিয়ার মেহেরপুর, দ্বিতীয়ত. পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর। আমার সাধ্যমতো সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি তাকে ধরার জন্য যদিও আমি জানি, সে ইনডিয়া পালিয়ে থাকলে তাকে ধরা কতোটা কষ্টকর। তার বিরুদ্ধে থানায় এজাহার করা হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, এ পোড়ার দেশে কিছুই হবার নয়। কারণ কয়দিন আগে আমাদেরই এক অফিসারের ছোট বোনকে দিনের আলোয় পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে মারা হলো। পরবর্তীকালে সে ঘটনায় চার্জশিট দাখিল হলো আত্মহত্যা। সুতরাং আমি কিছুই আশা করি না। শুধু আশা একটাই, মহান আল্লাহ তাকে ছাড়বে না।

যাই হোক। যেদিন বাবার মরদেহ বাসায় আনা হলো সেদিন দেখলাম বাসা ভর্তি লোকজনের মধ্যে একটা উৎসব উৎসব ভাব। ব্যাচে ব্যাচে খাওয়া চলছে। সঙ্গত কারণেই নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম। আবার সেদিনই বাসার কর্ডলেস সেটটি এতো মানুষের ভিড়ে চুরি হয়ে গেল। বাহ, কি আমাদের চরিত্র!

জীবনের উপলব্ধি শুরু হলো বাবার মৃত্যুর পর। যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাংক, থানা, কোর্টে লাইন দিয়ে বসে থাকি তখন বুঝতে পারি বাবা মানুষের জীবনে কি? আমাদের জীবনটা আসলেই খুব খারাপ। তাই তো বাবার বন্ধুরা আজ কেউ খোজখবর নিতে আসেন না।

সেনা চাকরির সুবাদে প্রতি ঈদ বাসায় করা যায় না বলে নামাজে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, আল্লাহ! আমি যেন পরবর্তী ঈদে আমার অসুস্থ বাবাকে দেখতে পাই। যাই হোক। আল্লাহর কাছে আমার এখন একটাই প্রার্থনা যে, সে যেন আমার বাবার কবরের আযাব লাঘব করে তাকে জান্নাতবাসী করেন।

সবার কাছে একটাই মিনতি, মা-বাবা বেচে থাকতে মা-বাবার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন আর যতোটা পারেন তাদের সঙ্গ দিন। বিদেশে তাদেরকে চিকিৎসায় পাঠালে আমাদের মতো ভুল করে একা একটা অপরিচিত অমানুষের সঙ্গে না পাঠিয়ে পরিবারের নিজস্ব কাউকে অবশ্যই সঙ্গে পাঠাবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে

শাড়ি সুখ

– ডা. দিলশাদ বানু

আলমারিতে স্তরে স্তরে সাজানো শাড়িগুলো মাঝে মধ্যেই আমাকে বেদনার্ত করে তোলে, টেনে নিয়ে যায় ধূসর অতীতে। অনেকটা যেন খুচিয়ে তোলে যেসব দিনের যন্ত্রণাময় ছোট ছোট ঘটনা যখন আমার থাকতো

গুটিকয়েক শাড়ি, সবই প্রায় মামুলি। দামি শাড়ি বলতে ছিলই না। কদাচিৎ কোনো অনুষ্ঠানে গেলে শাড়ির ঝলমল আসরে উপলব্ধি করতাম সবচেয়ে কম দামি শাড়ি আমার গায়ে।

আজ আমার অনেক শাড়ি। দামি শাড়িসহ বেশির ভাগই উচু মানের। প্রতিদিন ভিন্ন শাড়ি পরতে পারি, উপহার দিতে এবং নিতে দুটোই পারি। কোনো কটূক্তি আর আমাকে বান বিদ্ধ করে না, শাড়ির দৈন্যেও ভুগি না। কিন্তু জীবনের সোনালি দুপুর অর্থাৎ যে বয়সে মনটা থাকে সবচেয়ে রঙিন সে সময়টা অনেক আগেই পার হয়ে আজ অপরাহ্নে পৌছে গেছি। বঞ্চিতভাবে জীবন কাটিয়ে এতো শাড়ি এখন আর আমাকে কি–ই বা দিতে পারে, ওদের মালিক হওয়ার পরিতৃপ্তি ছাড়া! এগুলোর দিকে তাকিয়ে সাধ জাগে জীবনটাকে যদি আরেকবার পাল্টে ফেলা যেতো।

কলেজে পড়ার সেই দিনগুলোতে নিত্যনতুন শাড়ি পরতে কতোই না ভালোবাসতাম। আর্থিক সামর্থের সীমাবদ্ধতায় কম দামের পছন্দসই শাড়ি কিনে আনন্দে আত্মহারা হতাম এবং যক্ষের ধনের মতো সেগুলো আগলে রাখতাম। এতোটাই শাড়িপাগল ছিলাম যে, মনে হতো মৃত্যু হলে সেগুলোও সঙ্গে নেবো কবরে।

কিন্তু বিবাহিত জীবনে এক সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত স্বামীর কারণে শাড়ির শখ জলাঞ্জলি দিলাম। প্রথম প্রথম বছরে দুই তিনটি শাড়ি কিনে দিলেও ক্রমেই সব স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার সঙ্গে সেটাও প্রায় বন্ধ করে দিল ভদ্রলোক। নিজে কেনার সামর্থ থাকলেও শুধু অফিসের প্রয়োজনে কদাচিৎ দুই একটি শাড়ি কেনা ছাড়া দামি শাড়ি কেনার সাহস বা অধিকার কোনোটাই ছিল না। শাড়িকে কেন্দ্র করে টুকরো টুকরো কয়েকটি ঘটনা আজও যন্ত্রণার কাটা হয়ে জেগে আছে মনে।

একবার কোরবানি ঈদের আগে দুটি শাড়ি ছাড়া বাকিগুলো চুরি হয়ে গেল। ঈদের আগে রাতে একটি পরে নাইট ডিউটিতে গেলাম। পরদিন এসে দেখি অর্থাৎ ঈদের দিন ভোরে কাজের বুয়া একমাত্র অবশিষ্ট শাড়িটি নিয়ে পালিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ওই শিফন শাড়িটি দিয়েছিলেন মিসেস আলী আসগর, তদানীন্তন চিফ সেক্রেটারি মি. আলী আসগরের স্ত্রী।

এতে কর্তাব্যক্তিটি আমার দুঃখে এতোটুকুও দুঃখিত হলেন না বা একটা শাড়িও কিনে দিলেন না। পরে থাকা শাড়ি সম্বল করে ঈদের দিনসহ কাটলো আমার আরো চার পাচ দিন।

একবার এক ভাগ্নির ডেলিভারি করানোর উপলক্ষে একটি জরিপাড় শাড়ি পেলাম। কিন্তু সেটার ওপরও কর্তার কর্তৃত্ব বর্তালো। কি নিয়ে একদিন ঝগড়া হলে সেটিকে আলমারিতে তালা বন্ধ করে চাবি সরিয়ে রাখলো প্রায় আট দশ দিন।

ভাইসম একজন পাকিস্তান থেকে একবার একটি শাড়ি পাঠালে ভদ্রলোক, সেটার বিকৃত অর্থ করে সবার কাছে বলে বেড়ালো।

আমার সেই দুঃসহ দিনগুলোতে বড় বোনই ছিল একমাত্র সহায়। ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও সমপাঠীদের সমান হয়ে কেন চলি না এ নিয়ে আপার আক্ষেপের সীমা ছিল না। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরের আগ পর্যন্ত বোনই আমার সব শাড়ির যোগান দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত কতো শাড়ি যে তার কাছ থেকে পেয়েছি তার হিসাব রাখিনি। আজও আপার দেয়া অনেক ভালো শাড়ি আলমারিতে রয়েছে।

বোনের শাড়িতেও রক্ষা ছিল না এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করেও অনেক সময় নানান কটূক্তি শুনতে হতো।

মনে পড়ে যুদ্ধের বছর আপা অফিসে পরার জন্য করাচির দুটি শিফন শাড়ি পাঠালেন। একদিন দেখতে পেলাম একটি শাড়ির প্রায় সাত আট জায়গায় এক দেড় ইঞ্চি করে ব্লেড দিয়ে কাটা। বুঝতে দেরি হলো না এটা কার কাজ। জিজ্ঞাসা করলে পরিস্থিতি খারাপ ছাড়া সুরাহা হবে না জেনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সেগুলো রিপু করে নিয়েছিলাম।

সেসব দিন পেছনে ফেলে আজ আমি সব দিক দিয়েই মুক্ত। দেয়ার চেয়ে পাই অনেক বেশি, বিশেষ করে শাড়ি। প্রতি বছর অন্তত পাচ ছয়টি শাড়ি যোগ হয় নতুন স্টকে। সব তো পরা হয় না। তাই কিছু রয়ে যায় আনকোরা। কোনো কোনোটার সঙ্গে বিশেষ স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে। অকাতরে বিলিয়ে দিতেও মন চায় না। তবে এগুলো দেখেও যেন আনন্দ পাই যে সুখ থেকে আমি অনেকগুলো বছর পুরোপুরি বঞ্চিত ছিলাম।

মালিবাগ, ঢাকা থেকে

বিব্রতকর

– মেঘলা

প্রতিটা মানুষের জীবনেই সুখ এবং দুঃখ পাশাপাশি একান্ত আপন হয়ে পথ চলে। কিন্তু সময়ের স্রোতে সবই এক সময় স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে যায়। কিছু কিছু স্মৃতি বিব্রতকর। এমনই একবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে।

সেই বছর আমার জীবনের কৈশোরকালের প্রথম ঈদ। অর্থাৎ প্রথম ওড়না পরলাম। মনে আছে ড্রেসটা ছিল খুবই সুন্দর। নেভি ব্লু কালার জামায় কাচ বসানো, ওড়নাটাও একই রঙ–এর। চলাফেরায় কপট গাম্ভীর্য এনে বড় বড় ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর মাঝে মধ্যেই কারণে–অকারণে ওড়না ঠিক করছি। অবশ্য ওড়না পরাটা তখনোও আমার জন্য এতো বেশি জরুরি ছিল না। তবুও প্রথম পরলাম তো!

হঠাৎ করেই ভাইয়া বললেন, চল বেড়াতে যাবি?

নিমেষেই রাজি হয়ে গেলাম। ভাইয়ার ছাত্রীর বাসায় গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প–গুজব করলাম। তারপর চলে আসার পালা। ভাইয়া বললো, ওড়নাটা গুছিয়ে হাতে নিয়ে নাও। কারণ সেখানে যাবার সময় ওড়না সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার কেন যেন মোটেও ইচ্ছা করছিল না। অগ্যতা কি আর করা! ভাইয়াও আর বললেন না।

মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে কিছু দূর আসার পরই মনে হলো ওড়নাটা কোথাও আটকে যাচ্ছে। ভাইয়া একপাশে থামালেন। না, ভয় নেই চাকায় লাগেনি। পেছনের সিটের একটা স্টিলের পাতের সঙ্গে লেগেছিল। আবার স্টার্ট দিয়ে চলে এলাম।

পাড়ায় ঢোকার মুখে হঠাৎ মনে হলো আমার ওড়না ধরে কেউ খুব জোরে টানতে চাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে ভাইয়াকে বলতেই স্টার্ট বন্ধ করে মোটর সাইকেল একপাশে দাড় করালেন। আমার গায়ের ওড়নাটা চাকার খুব পছন্দ হয়েছিল হয়তো। তাই জড়িয়ে ফেলেছে। একে একে বেশ কিছু চেনামুখ জড়ো হলো। কিভাবে চাকায় জড়ালো, কেন সাবধান হলাম না ইত্যাদি। উপদেশ বাণী এবং নোংরা চাহনির যন্ত্রণায় আমার তখন নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। ইশ, কেন যে তখন ভাইয়ার কথা শুনে ওড়নাটা হাতে নিলাম না! তাহলে হয়তো এই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে অন্তত পড়তে হতো না। মেকানিক এসে চাকা খুলে তারপর ওড়নাটা বের করে দিয়েছিল। একটা ওড়নার জন্য এতো কষ্ট!

জীবনের প্রথম ওড়না পরে বেড়ানো! মনে রাখার মতো ঘটনা না হলে কি হয়? এখনো ঈদ এলেই মনে পড়ে ঘটনাটা। আর হাসি পায়। ছিঃ, কি লজ্জাটাই সেদিন পেয়েছিলাম!

সকলের উদ্দেশ্যে একটা অনুরোধ, মোটর সাইকেল, রিকশা বা অন্য যে কোনো যানবাহনে চড়ার সময় খেয়াল রাখবেন শাড়ির আচল বা ওড়না ঠিক আছে কি না। তা না হলে যে কোনো মুহূর্তে বড় বিপদও হতে পারে!

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

জীবন থেকে শেখা

– কাজী আবদুল আলিম বিন নূরুউদ্দিন

গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমি। ছোটবেলা থেকেই দারিদ্র্যের মাঝে ঠোকর খেতে খেতে বড় হয়েছি। পড়াশোনার সুযোগ তেমন একটা হয়নি। হাতের কাছে খুজেছি কাজ। কোনো কাজ না শিখলে তো আর করা যায় না। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি সিনেমা হলের মেশিন চালানোর কাজ শিখতে লাগলাম। কাজ শিখলাম। কিন্তু অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা আর হলো না।

চাকরি নিলাম সিনেমা হলে, বেতন সামান্য। তাও অনেক সময় বাকি থাকে। হল কিছুদিন চলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তো আর চলতে পারে না। তাই মন চাইলো ঢাকা শহর পানে উড়াল দিতে। ঢাকায় নাকি টাকা উড়ে বেড়ায়। ঢাকা যাবো যে, তেমন পরিচিত কেউ নেই। প্রবাদ আছে, *খোজার মতো খুজলে খোদাকেও পাওয়া যায়।* আমিও তেমন খুজে পরিচিতজন পেলাম। সে আমাকে অনেক আশার কথা শোনালো। আমি সেই আশায় বুক বেধে তার সঙ্গে ঢাকায় চলে এলাম।

অপরিচিত ঢাকা শহর। কি কাজ করবো, কে আমাকে কাজ দেবে? শেষমেষ একটু লাইন করে সোয়েটার কারখানায় কাজ নিলাম। বেতন কাজের ওপর। আমি কাজ পারি না, কয় দিনেই তা শিখে নিলাম। বেতন হচ্ছিল বেশ মোটামুটি চলার মতো। কিন্তু আমি যার সঙ্গে ঢাকায় এসেছি সে আমাকে নিয়ে চলে এলো ফতুল্লা লামাপাড়ায়। সেখানে এসে পড়লাম বিপাকে। শহর এলাকা, থাকা খাওয়ায় খুব অসুবিধা হতে লাগলো।

তেমন কোনো কাজও নেই। তাই কিছু একটা করতে হবে। এই ভেবে তার দূরসম্পর্কের ফুপাতো শ্বশুরের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ জুট মিলে পার্টটাইম কাজ নিলাম। ফুপাতো শ্বশুরও সেখানে কাজ করেন ভালো বেতনে। কিন্তু আমি লেবার পোস্টে কাজ পেলাম। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি। টাকাও তাতে অল্প। তার উপর লামাপাড়া থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত পায়ে হেটে যেতে হয় টাকার অভাবে। তাতে করে শরীর আর কুলায় না। সেটা বাদ দিয়ে কাজ নিলাম গোরস্থান নামে এক জায়গার হোটেলে। সেখানে রাত ও দিনে দুই সময়ই কাজ করতে হয়। খাওয়া ও সামান্য বেতন দেবে। তাও আবার বাকি।

এতো কিছু করেও ঠিকমতো পয়সা না পাওয়ায় মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাই মন আর শহরে থাকতে চাইলো না। টান দিল বাড়ির দিকে। যে আশায় শহরে গেলাম সে আশা পূরণ হলো না। যে আমাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল সে বলেছিল, আমাকে সিনেমা হলে চেকারের কাজ নিয়ে দেবে। তা তো সে দিতে পারলোই না, অযথা আমাকে হয়রানি করলো। সে জানতো আমি সিনেমা হলে চেকারের কাজ পারি। আমিও সেই আশায় গিয়েছিলাম তার সঙ্গে।

সে যখন পারলো না তখন আমিও অনেক অফিসে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব জায়গায় ঠোকর খেয়ে ফিরে এসেছি। তাতে করে এই শহরের প্রতি আমার একটা ক্ষোভ জন্ম নিল। এ শহর আসলেই একটা নিষ্ঠুর শহর। আর এখানে নয়, কিছু যদি করতে হয় তা হলে তা আমার নিজের গ্রামেই গিয়ে করবো।

চলে এলাম আমার নিজের গ্রাম মহেশপুরে। যোগ দিলাম আবার সিনেমা হলের মেশিন চালানোর চাকরিতে। এবার হল ভালোভাবেই চলছে। শুরু হলো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মিশন। চাকরির পাশাপাশি বিদ্যুতের কাজ শিখে তা করতে লাগলাম। শুরু হলো কর্মতৎপরতা। এখন চাই শুধু কাজ আর কাজ। চাকরিতে বেলা এগারোটা থেকে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত ডিউটি। তারপরও সকালে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে বিদ্যুতের কাজে বেরিয়ে পড়া, ডিউটির আগ পর্যন্ত কাজ করা।

আশা আমার অনেক, চেষ্টাও অনেক। আমি নিজে তেমন লেখাপড়া করতে পারিনি দারিদ্র্যের কারণে। তাই বলে ছোট ভাইবোনকে তা হতে দিতে পারি না। তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছি। তারা শিক্ষিত হবে এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

হলের চাকরি, বিদ্যুতের কাজের পাশাপাশি, বরগা জমি নিয়ে কৃষি কাজও এখন আমার প্রধান আয়ের উৎস। আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে আমার কর্মদক্ষতার গুণে আজ আমি একজন সচ্ছল ব্যক্তি। এই কাজের মূল উৎস জীবনের প্রতিটা পদে পদে ঘা খেয়ে শিক্ষা নেয়া।

জীবন চলার পথে যদি কেউ হোচট খেয়ে তার সঠিক গন্তব্য পৌছাতে পারে, তার কাজ ও দক্ষতা ধরে রাখতে পারে তবে আশা করা যায়, সে একদিন অবশ্যই সুখের মুখ দেখবে। এবং সে সমাজে বড় মানুষ হয়ে উঠবে। এটা আমার নিজের জীবন থেকে শেখা।

মহেশপুর, ঝিনাইদহ থেকে

প্রিয় স্যার

– মোহাম্মদ সানাউল হক

হরতালের কারণে পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে যাচ্ছিল বার বার। তিনটি পরীক্ষা যথারীতি দেড়টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাকি কয়েকটি পরীক্ষার একটি অর্থাৎ চতুর্থ পরীক্ষাটি রমজানের জন্য দেড়টার পরিবর্তে সাড়ে নয়টায় আনা হয়েছিল। বিপত্তি ঘটেছিল সেখানেই।

রাজনৈতিক কারণে তখন আমি হলে থাকতে পারছিলাম না। গোড়ানের একটি ভাড়া বাসা থেকে এসে পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। চতুর্থ পার্ট–এর পরীক্ষা দেয়ার জন্য বাসা থেকে রওনা দিয়েছিলাম দশটার দিকে। ক্যাম্পাসে আসার জন্য একটু আগেভাগেই এ পথ চলা। ঠিক বারোটায় কলা ভবনে উপস্থিত হই। ডিপার্টমেন্টের সামনে এসে একটি সিগারেট ধরিয়েছি। এমন সময় কামরুলভাই (অফিস সহকারী। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি) আমাকে বললেন, আপনার আজ পরীক্ষা নেই?

কেন? পরীক্ষার জন্যই তো এলাম। তিনি বললেন, পরীক্ষা কখন?

দেড়টায়।

কে বলেছে দেড়টায় আপনি জানেন না, রমজানের কারণে সাড়ে নয়টায় আনা হয়েছে? রুটিন দেখেননি? রুটিনে তো সাড়ে নয়টায় লেখা রয়েছে।

ভুল হয়েছে আমারই। সবগুলো দেড়টায় হয়েছে। কাজেই এ পার্ট–এর সময়সূচি খেয়াল করিনি।

তাড়াতাড়ি হলে যান, দেখেন কিছু করতে পারেন কি না।

কামরুলভাইয়ের পরামর্শে ছুটে যাই চার তলায় পরীক্ষা রুমে। আমাকে দেখে সহপাঠী সবাই লেখা বন্ধ করে দিয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

স্যারকে বললাম, আমি মনে করেছিলাম পরীক্ষা দেড়টায় তাই দেরি হয়ে গেছে।

স্যার বললেন, তুমি বসো দেখা যাক কি করা যায়। পিয়নকে পাঠালেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে খাতা আনার জন্য। কেননা শুধু অংশগ্রহণ করতে পারলেই চলবে। পরে ওই পার্টে মান উন্নয়ন দেয়ার সুযোগ আছে। কন্ট্রোলার রুম থেকে জানানো হলো, খাতা দেয়া যাবে না।

এবার স্যারই গেলেন খাতা আনার জন্য। স্যারও ফিরে এলেন শূন্য হাতে। স্যারকে খুবই উত্তেজিত মনে হলো। আমাকে জানানো হলো, সরি, পরীক্ষা দিতে পারবে না।

এতোক্ষণে নিজেকে খুবই অসহায় মনে হচ্ছে।

আমার কারণে অন্যদেরও মনোযোগ ব্যাহত হলো। এ পরিস্থিতিতে স্যার আমাকে বললেন, তুমি পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।

স্যারই ছিলেন এ কোর্সের শিক্ষক। পরীক্ষার পরে স্যারের রুমে দেখা করতে গেলাম। স্যার আমাকে বুকে জড়িয়ে হু হু করে কেদে উঠে বললেন, আমি ব্যর্থ হলাম, তোর জীবনের মূল্যবান একটি বছর রক্ষা করতে পারলাম না।

স্যারের এমন ব্যবহারে আমিও আবেগ ধরে রাখতে পারলাম না। আমিও কেদে উঠলাম।

স্যার আমাকে বললেন, তুই চিন্তা করিস না, অন্য পরীক্ষাগুলো চালিয়ে যা, আমি তোকে ইনকোর্স, টিউটরিয়াল-এ ত্রিশের মধ্যে সাতাশ নাম্বার দিয়ে দেবো। দেখি কন্ট্রোলার ব্যাটা তোকে আটকায় কি করে?

এমন পরিস্থিতিতে মনোবল ভেঙে পড়েছে। তাই পঞ্চম পার্ট ভালো হয়নি অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস পাওয়ার মতো নাম্বারও পাবো না। তাই পরীক্ষা ড্রপই দিয়ে দিলাম।

ক্যাম্পাসে অনিয়মিত। বাসা থেকেই পুনরায় প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কোনো ঝুট-ঝামেলা ছাড়া পরীক্ষা শেষ করলাম পরের বছর। রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছি। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই হয়তো রেজাল্ট বের হবে এমনি শোনা যাচ্ছিল। রেজাল্ট বের হওয়ার ঠিক একদিন আগেই সেই প্রিয় স্যার সৈয়দ আহম্মেদ খান আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন যেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসে না।

পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিলাম। রজনীগন্ধা আর গোলাপের তোড়া স্যারের সমাধিতে দিয়ে ফিরে আসছিলাম। তখন শুনতে পেলাম স্যার আমাকে বলছেন, তুই পাস করেছিস, আমি খুবই খুশি।

ফিরে দেখি গোলাপের পাপড়ির ওপর সূর্যের আলো পড়ে আমার চোখের জলবিন্দুগুলো ঝিলমিল করছে। মনে হচ্ছে, আমার এ সাফল্যে সৈয়দ আহম্মেদ খান স্যার হাসছেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের বিরুদ্ধে যখন ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে তখন মনে হয় তারা শিক্ষক নয়, হিংস্র হায়েনার দল।

আবার সৈয়দ আহম্মেদ খান-এর মতো শিক্ষকদের মনে হয় স্বর্গের দূত। তারাই তো সত্যিকারের দ্বিতীয় জন্মদানকারী শিক্ষাগুরু, দ্বিতীয় পিতা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

ভালো আছি

আমার এইচএসসি পরীক্ষার পরই বিয়ে হয়ে যায়। সাংসারিক জীবনের প্রথম দুই বছর লেগে যায় আমার স্বামী দেবতাকে চিনতে। কিন্তু তখন আমার কিছু করার ছিল না। কারণ ততোদিনে আমি মা হতে চলেছি।

অনেক কষ্টে বিএসসি পাস করে তারপর সম্পূর্ণ বাবার পয়সায় এমএসসি-তে ভর্তি হই। ছোট বাচ্চা থাকার কারণে নিয়মিত ছাত্রী হলেও অনিয়মিত ছিলাম। কাজেই সহপাঠীদের কাছ থেকে নোট যোগাড় করে আমাকে পড়তে হতো। ঠিক সেই সময় আমার বান্ধবীর মাধ্যমে পরিচয় হয় আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে। তার কাছ থেকে আমি অনেক সাহায্য পেতাম।

এ সহযোগিতাই একদিন কাল হয়ে দাড়ায়। আমার স্বামী আমাকে কিছুটা সন্দেহ করতে থাকে। কিন্তু আমার বা বন্ধুর মধ্যে তখনো কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। স্বামী দেবতা জোর করে নিয়ে গেল তার ঢাকার বাইরের কর্মস্থলে। তাতেই শুধু ক্ষান্ত নয়, যতো প্রকার কুৎসিত কার্যকলাপ ছিল তার সবটুকুই আমার ওপর প্রয়োগ করলো। ঠিক তখনই শুরু হলো তার প্রতি আমার ভালোলাগা।

দীর্ঘ দুটি বছর তার সঙ্গে আমার দেখা হলো না, কথা হলো না। কিন্তু এই দুটি বছর আমার মনে হয়েছে, প্রতিদিন ভেবেছি, আমি তাকে ভালোবাসি। এর মধ্যে এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম। ক্লাস না করেও সেকেন্ড ক্লাস পেলাম। আমার সেই বন্ধুর নোটেই। সে আমার জন্য বান্ধবীর কাছে নোট পাঠিয়ে দিয়েছিল যেন ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারি। আমার প্রতি তার এতো দায়িত্ববোধ দেখে তাকে আরো ভালোবেসে ফেললাম।

তিন বছর পর তার ফোন নাম্বার পেলাম। এরপর প্রায়ই তাকে ফোন করতাম। তার কাছে যখনই ফোন করতাম তখনই সে শুধু স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে কিভাবে ভালো থাকবো তার উপদেশ দিতো। এই সব কিছু তার প্রতি আরো দুর্বল করে দিল আমাকে।

তারপর একদিন ২০০৩-এ তাকে ফোনে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে ভালোবাসে কি না?

অনেক কষ্টে তার মুখ থেকে বের করলাম সেই শব্দটি। এতো চাপা ও সংযমী পুরুষ আমি খুবই কম দেখেছি। এর দুই দিন পর অর্থাৎ দীর্ঘ তিন বছর পর তার সঙ্গে দেখা করলাম। ছদ্মবেশে ঘুরলাম তার হাত ধরে। স্বামী ছাড়া এই প্রথম কোনো পুরুষের হাত ধরেছি। ভেবেছি অন্যায়। কিন্তু এই অন্যায়টা শুধু স্বামীর কারণে ন্যায় হয়েছে।

স্বামী আমার প্রতি কখনোই নজর দিতো না। সে থাকতো তার সাহিত্যের জগৎ নিয়ে। বিছানায় যখন মিলিত হতাম তখন শুধু বলতো, ভালোবাসি। বুঝতাম ভালোবাসাটা শরীরগত।

হ্যা, আজকে বলতে এতোটুকু দ্বিধা নেই যে, আমার বন্ধুটিকে অনেক ভালোবাসি। প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমার মনে হয় তাকে খুজে পাই। তবুও আজ বলতে ইচ্ছা করে, অনেক অনেক বছর আগে তার সঙ্গে কেন আমার দেখা হলো না!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

খাওয়া- দাওয়া

– সবুজ হৃদয়

আমি তখন মস্ত বেকার। আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন ছেড়ে গোড়ানে থাকি বড় বোনের বাড়িতে। প্রতিটা পত্রিকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পড়ি। অ্যাপলিকেশন করি। বোনের বাড়িতে কাজের লোক নেই। তাই টুকটাক ফরমায়েশ খাটি। বাজার সওদা করি। একমাত্র ভাগ্নেটাকে স্কুলে নেয়া-আনা করি। কখনো ইন্টাভিউয়ের ডাক পেলে *বাবু*-টি সেজে অফিসে দৌড়াই। স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন যায়। চাকরির সোনার হরিণ আর ধরা দেয় না।

ভাগ্নেটার স্কুলে প্রায়ই দেখি এক যুবতী। ফর্শা, স্বাস্থ্যবতী। ডাগর চোখের অধিকারী। সদা হাস্যময়ী। অপেক্ষমাণ অভিভাবকের ভিড়ে সহজেই তাকে আলাদা করা যায়। তার রহস্যভরা কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে মনে হয় সদ্য কৈশোর পার হয়নি তরুণী। অথচ তিনি দুই সন্তানের জননী।

তার দিকে তাকালেই আমি কেমন যেন হয়ে যাই। দুঃখজনকভাবে সত্যি, আমি যেই চারতলা বাড়ির নিচতলায় আশ্রিত সেই বাড়ির চতুর্থ তলায় এই হাস্যময়ীর অবস্থান। তাই স্কুল ছাড়াও বাড়ির গেটে প্রায়ই দেখা হয়। এবং অন্য রকম এক অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসে। আমি মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে যাই। কখনো কথা বলা তো দূরের কথা, দ্বিতীয়বার তাকাইও না।

একদিন সকালে হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, এই যে ভাই সঞ্জয় দত্ত, আমাকে একটু নাশতা এনে দেবেন?

প্রতিবাদ করি, আমি সঞ্জয় দত্ত নই। সঙ্গে আমার নামটিও বলে দিই।

তিনি বলেন, সঞ্জয় দত্তের মতো ফিগার, চেহারা, উচ্চতা। নাম তো জানি না। তাই ওই নামে ডাকলাম।

ভাবনায় পড়লাম। আমি কি চাকর টাইপের প্রাণীতে পরিণত হলাম নাকি! না হলে যে মহিলা নিজের বাচ্চা দুটোকে স্কুলে নেয়া-আনা করছে, সে দোকান থেকে খাবার না কিনে আমাকে ফরমায়েশ দিচ্ছে কেন? তবুও নিতান্তই ভদ্রতাবশত বললাম, দিন কি আনতে হবে?

তিনি বললেন, বান (Bun) রুটি আর কলা। আমি চারতলার বামপাশে থাকি। একটু দিয়ে যাবেন প্লিজ!

বলার ভঙ্গিমায় গলে গেলাম। ভাবলাম মহিলা মানুষ। দোকান থেকে রুটি, কলা কিনতে প্রেস্টিজে লাগছে।

সুবোধ বালকের মতো রুটি, কলা নিয়ে যখন চারতলায় নক করলাম, দরজা খুলতেই দেখি শুরুতেই ড্রয়িংরুমটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। এক কোণে মস্ত এক রেফ্রিজারেটর। সুদৃশ্য টেলিভিশন, মিউজিক

ডেক সেট। সোফার কুশনগুলোয় মনকাড়া হাতের কাজ। পাশেই ডাইনিং স্পেস। টেবিলে ফলমূল, আচার, সস, সুন্দর করে সাজানো। বোঝা যায় মহিলা খুব ভোজন রসিক।

বললেন, চা খাবেন, বসুন। বাচ্চা দুটো স্কুলে, সাহেব অফিসে। এ সময়টুকু কাটেই না। মহামান্য বুয়া আসবে বারোটায়। তারপর রান্না-বান্না ইত্যাদি।

নিতান্তই একটা খালি ঘরে এমন একটা ফাটাফাটি যুবতীর সঙ্গে একাকী বসে চা খাওয়া ভদ্রতা মনে করলাম না। বললাম, ধন্যবাদ, অন্য কোনোদিন খাওয়া যাবে, আজ আসি।

জবাবে হাস্যময়ী যে হাসি আমাকে উপহার দিলেন তার রহস্য উদঘাটনের ক্ষমতা আমার ছিল না।

তারপর থেকে স্কুল, গেট, রাস্তায় দেখা হলে ডাগর চোখে ঘুম ঘুম ভাব এনে দিতো চমৎকার হাসি। কিন্তু তেমন কথা হতো না। এতেই কেন আমার ভেতর তোলপাড় শুরু হতো বুঝতাম না। প্রতিদিন তো আরো কতো সুন্দরী চোখে পড়ে। এমন অনুভূতি কারো বেলায়ই হয় না। এটা কি প্রেম, নাকি কাম অনুভব! বিভ্রান্ত হতাম। কাম অনুভব হলে তো দেহের নিচের দিকটাই শুধু আলোড়িত হতো। এ যে বুকের মাঝেও ঝড় তোলে। প্রতিটা রক্ত কণিকার চলাচল দ্রুত হয়ে যায়। বুঝি না কেন এমন হয়। এমন সময় নিজের ওপর খুব রাগ হতো।

একদিন হঠাৎ সিড়িতে দেখা। হাত ধরে জোর করে টেনে আমাকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন চারতলায়। বললেন, সেদিন চা খাননি, আজ খেতেই হবে।

তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। কিন্তু তার স্পর্শ যে আমাকে বিদ্যুতায়িত করে ফেলেছে সেই অভিব্যক্তি অনেক কষ্টে গোপন রাখলাম। টুকটাক কথার পর চা পর্বে দেখি রেফ্রিজারেটর খুলে নানান খাবার আমার সামনে তুলে ধরলেন। পুডিং, পেস্ট্রি, ফালুদা এবং সব শেষে চা।

বিস্মিত হয়ে বললাম, এতো খাবার! তবুও আপনি রুটি, কলা দিয়ে নাশতা করেন কেন?

তিনি বললেন, আমার আনকমন খাবার ভালো লাগে। পাই না। তাই খাই না। যেমন আলু আর বেগুন ভর্তা আমার খুব প্রিয়। আমাকে খাওয়াবেন একদিন?

বললাম, আমি ভর্তা বানাতে জানি না।

তিনি বললেন, আপনি ব্যবস্থা করলে আমিই বানিয়ে নেবো।

বললাম, ঠিক আছে, এটা তো তেমন দামি জিনিস নয়। চাইলে এখনই বাজার থেকে এনে দিতে পারি।

আমার কথা শুনে আবার সেই ভুবন ভোলানো হাসি। সেই হাসিতে আছে অপার রহস্য। দুঃসাধ্য সেই রহস্য উদঘাটন। আমার কেবলই মনে হয় অন্য কোনো কিছু, অন্য কোনো কথা যা তিনি চাইছেন অথচ বলছেন না। আমিও সাহস করি না। পাছে আমার ধারণা ভুল হয়।

তারপর থেকে তার কাটে না সময় মুহূর্তগুলোয় আমি প্রায়ই যাই, সঙ্গ দিই, গল্প করি। তার রহস্যময় কথা অধিকাংশ না বুঝলেও উপভোগ করি। ভালোই লাগে। তার সান্নিধ্যে হরমোনের প্রভাবে আমার কি যে অবস্থা, কি যে ভাংচুর হয় দেহ, হৃদয়, মনে! তা সম্ভব অভিব্যক্তিতে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

বেকারত্বের দিনগুলোয় এমন হাসি-খুশি, আনন্দ-ঠাট্টা একঘেয়ে জীবনে কিছুটা ছন্দ এনেছিল। মানুষে মানুষে নিটোল সম্পর্কের ধারণা আমাকে বিমোহিত করেছিল। কিন্তু আমি সর্বদা লুকিয়ে রাখতাম আমার রক্ত কণিকার তোলপাড় যা কিছু প্রচণ্ড যৌবনের স্বভাবজাত বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া তিনি তো আমার সিনিয়র। আমার ভেতরকার এই ভাংচুর যদি টের পান নিশ্চয়ই আমাকে প্রচণ্ড বদমাশ ভেবে দূর দূর করবেন আমিও হারাবো আমার একঘেয়ে জীবনের একটু ব্যতিক্রম ধারা।

এরই মাঝে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হলাম। আমি বয়সে ছোট হওয়ায় আমাকে তুমি বলা শুরু করেছেন। তিনি বলেন তার ছেলেবেলার কথা, পারিবারিক কথা, এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত কথা যা শুনে কখনো আনন্দিত হই, কখনো বিমর্ষ বোধ করি। কখনো হরমোনের প্রভাব তীব্রতর হয়।

একদিন তিনি বললেন, সব সময়ই তো আমার ইচ্ছেমতো খাবার দিই। আজ তুমি যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াবো। যা খুশি তা, তুমি চাইতে পারো নির্দ্বিধায়। আজ তোমার সাত খুন মাফ। বলো কি চাও?

আমি এতো বোকা আর ভীতু যে কিছুই চাইতে পারি না। ইচ্ছে হয় বলি, তোমার চলন-বলন, আচরণ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। আজ তোমার রক্তিম ঠোটে খাবো আমার তৃষিত চুমু। কিন্তু বলার সাহস হয় না।

তিনি আমার গাল টিপে বলেন, বুঝেছি, চা তোমার প্রিয়। চা খাও, অন্য কিছু খেতে মন চাইলে অবশ্যই আমাকে বলবে। কথা দিলাম, যতো দামি জিনিসই খেতে চাও খাওয়াবো।

আবারও সেই দুর্বোধ্য হাসি।

আমি বিভ্রান্ত হই। আমি বেকার আশ্রিত বলেই কি তিনি প্রতিটা প্রসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়ার কথা তোলেন। এটা করে তিনি এক ধরনের আনন্দ পান? আমি যখন খেতে থাকি তখন তিনি অপলক তাকিয়ে থাকেন। আচমকা হেসে ওঠেন। আমি বুঝতে পারি না। এসব কি স্নেহ, নাকি অন্য কিছু?

একদিন কথায় কথায় বলছিলেন স্বামীর ব্যস্ততার কথা, ভুলো মনের কথা, ক্লান্তিতে নাক ডেকে ঘুমানোর কথা।

আমি বুঝে ফেলি কোথায় তার শূন্যতা।

আমার তীব্র বাসনা জাগে। মনে হয় বলি, আমিই পূরণ করে দেবো তোমার যাবতীয় অপূর্ণতা। কিন্তু তা কি করে হয়। আমি যে ছোট।

এক মন বলে, হাস্যময়ী, তোমাকে একান্ত করে পেতে চাইছে। অন্য মন বলে, এ ভাবনাটাও অসুন্দর, অপবিত্র। কিন্তু বয়সের দাবি অনুযায়ী আমার শরীর সমস্ত যুক্তি হেলা করে রসায়ন বিক্রিয়া অব্যাহত রাখে। আমি তীব্র শারীরিক টান অনুভব করি। কিন্তু কিছুতেই তা বলি না, আচরণে প্রকাশ করি না।

একদিন এমনই এক মুহূর্তে যুবতী আমার জিনসের জিপারের দিকটা খেয়াল করলেন। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সেই রহস্য মাখা হাসি মুখে বললেন, ওটা খুব শক্ত হয়ে আছে যে, কিছু খেতে চায় মনে হয়।

আমিও আশকারা পেয়ে বলি, হ্যা। কিন্তু খুব ভীতু যে!

তিনি বলেন, খুব বেশি ভীতু হলে ক্ষিধে নিয়েই থাকতে হবে আমার মতো।

চমকে উঠি কথা শুনে।

আমি তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করি তার হিমালয়ের চুড়া। আকা-বাকা ঢেউ খাওয়া গিরিপথ।

তিনি আমাকে বুকে টেনে নেন। বুকের মাঝে আমার মুখ এমনভাবে জাপটে ধরেন যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

আমি অপটু প্রেমিক। কিন্তু ভালোবাসার খেলায় মেতে উঠি।

প্রেমের শিল্পকলায় তিনি আমাকে দক্ষ নিপুণ শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ওয়ারী, ঢাকা থেকে

পরাজিত

আমি বাবা হারা একজন এতিম মেয়ে। আমার কয়েকদিনের বয়সে বাবার মৃত্যু হয়েছে। তাই নানাবাড়িতে থাকতে হয়েছে যা মামা কোনোদিনই স্বাভাবিকভাবে নেননি। জীবনে অনেক কষ্ট, দুঃখ ও সংগ্রাম করেছি। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে রাজশাহী শহরের কলেজে ভর্তি হই। কলেজের সেই সময়ে অনেকের

সঙ্গে পরিচিত হবার এক পর্যায়ে দুই সহোদর ভাইয়ের সঙ্গেও পরিচিত হলাম। তাদের ছদ্ম নাম লিপক ও দীপক। দীপক ছোট ভাই।

এক সময় কলেজ পাস করে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং দীপক বিআইটি রাজশাহীতে ভর্তি হলাম। কলেজের পরিচিত বিধায় বিভিন্ন সময়ে দেখা ও কথাবার্তা হয়। তখনো প্রেম, ভালোবাসা সৃষ্টি হয়নি। এক সময় দীপক পাস করলো মেকানিকালে। কিন্তু আমি মাস্টার্স পড়ি সেশন জটের কারণে। একদিন তার বোনের মাধ্যমে (সেও রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিল) পাস করার সুসংবাদ পেলাম। সেও দেখা করলো। তার আমন্ত্রণে তাদের বাসায় গেলাম। তাদের মায়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। বাবা চাকরি সূত্রে অন্যত্র অবস্থান করছিলেন।

এরপর রাজশাহীতে সে একটি চাকরি পায়। বেশ ভালো। তবে অস্থায়ী। একদিন সে আমাকে কর্মস্থলে নিয়ে গেল। দুই একজন সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। রুমে বসে নাশতা খাবার সময় সে যা বললো তার মমার্থ হলো, সে আমাকে খুব ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। তবে তার একটু সময় দরকার। সব কিছুতেই রাজি হলাম। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে আমি বাড়ি চলে গেলাম।

ইতিমধ্যে সে এমএস করার জন্য সুইডেন গেল। সম্ভবত কম সময়ের কারণে আমার সঙ্গে দেখা হলো না। তবে আমার আত্মীয়ার মাধ্যমে একটা ফোন নাম্বার (ঢাকায় যেখানে সে থাকছে) দিয়ে কথা বলতে বললো। সেদিনের ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে থানা পর্যায়ের একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে অল্প কিছু কথা হলো। সেখানে গিয়ে সে চিঠি লিখলো ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনাসহ। আরো লিখলো আশা করি তুমি আমাকে মনে রাখবে, আমার জন্য অপেক্ষা করবে ইত্যাদি।

ঠিক এ সময় আঠারোতম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তার চাকরি পাই। তাকে জানালাম, সে খুশি হলো। অনেক কষ্ট করে প্রতি মিনিট একশ টাকায় তাকে ফোন করতাম। চিঠি তো উভয়েই লিখতাম। সে সব কথা লিখতো। কোথায় থাকে, কিভাবে খায়, কিভাবে বাসে চড়ে, পাতাল রেলে চড়ে ইত্যাদি। আমি যেন শাড়ি পরে ছবি পাঠাই এবং তার বাবা-মায়ের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা করি। তার কথামতো কাজ করলাম।

সে দেশে ফিরলো ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে। রাজশাহীতে আমার আত্মীয়ের বাসায় তার দেখা হলো। তার পুরনো কথা মণে করিয়ে দিলাম। সে তখন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে।

আমি আবারও দেশের বাইরে যাবো। তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। তুমি ইচ্ছেমতো বিয়ে করে নিও।

শুনে পাথর হয়ে গেলাম, কারণ চোখ দিয়ে পানি ঝরেনি। কিছুক্ষণ আমরা নীরব থাকলাম।

সে উঠে যেতে শুরু করলো।

আমি আবারও ভাবার জন্য খুব অনুরোধ জানালাম কোনো উত্তর নেই।

ভাবলাম আমার কোনো অপরাধ নেই। তাই সে ভুল বুঝবে।

এভাবে দুই বছর কাটলো। ভালোবাসার টানে নিজে থেকে তার অবস্থান জানার চেষ্টা করলাম। এক পর্যায়ে তার বাসায় ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে লিপককে চাইলাম।

অনেক কথায় মধ্যে সে জেনে অবাক হলো যে, আমি বিয়ে করিনি। কারণ সে এবং তার বোন নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে। খুব সুখে আছে। আমার দুঃখের কথা শোনার চেয়ে তাদের সুখের কথা বলতে বেশি আগ্রহী। দীপকের ঠিকানা চাইলাম এবং আমার অফিসের ফোন নাম্বার দিলাম। অনেক দিন হয় সে কোনো যোগাযোগ করে না। নিজেই ফোন করলাম। শুনলাম বাড়ি থেকে নিষেধ এবং দীপকও নাকি বলেছে যে, আমি যেন কোনোক্রমেই ঠিকানা না পাই। হতাশ হলাম। বিশ্বাস করলাম এবং করলাম না।

এরপর পরিচিত একজনের কাছে গেলাম। সেখানেও হতাশ। বেশ কয়েকবার লিপককে ফোন করলাম, অনুরোধ করলাম। মানুষ কুকুর-বিড়ালকেও এতোটুকু দয়া করে। সেটাও তাদের কাছ থেকে পেলাম না। শেষে তার মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম।

তিনি অন্যত্র বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন।

খুব কান্না এলো। বললাম, তাকে জানানোর জন্য এসব বলছি।

তিনি বললেন, তার ছেলে এমন কাজ করতে পারে না। এতোটুকু সান্ত্বনা দিলেন না।

অথচ তখনো আমি কাদছি। শেষে বললাম, কাউকে কষ্ট দিয়ে কেউ কখনো সুখী হয়নি, কখনো হবে না। তাকে সালাম দিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

জানি না কি আমার অপরাধ। আমার জীবনের মূল্যবান বছরগুলো তার জন্য অপেক্ষা করেছি। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রতিবার নামাজে তার মঙ্গল কামনা করেছি। অবশেষে আমি পরাজিত। এখন অফিসের চেয়ারে বসে কাদি। কোনো কাজে মন লাগে না। বাচতে ইচ্ছে করে না। কেন এই কষ্ট পেলাম? কেন তাকে ভুলতে পারছি না।

পাশের বাড়ি থেকে যতোদূর জেনেছি সে (দীপক) মাঝে থাইল্যান্ড ছিল। বর্তমানে আবারও সুইডেনে আছে এবং পিএইডি করছে। যেসব বাংলাদেশি ভাইবোন সুইডেনে আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, তাকে খুজে পেতে আমাকে সাহায্য করুন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জয়পুরহাট থেকে

অপয়া

– ইব্রাহীম খান

বগুড়া মহাস্থান জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে রোজ তিন তিন ছয় মাইল হেটে কলেজ করি। টমটম চলাচল করে। কিন্তু পয়সার অভাব। সেকেন্ড হ্যান্ড বা থার্ড হ্যান্ড একটা সাইকেল কল্পনাও করতে পারি না।

ইদানীং আটাপাড়ার বটতলার মোড় থেকে একজন মেয়ে আমার মতো হেটে কলেজে যায়। দুজন রাস্তার দুপাশ দিয়ে হাটি যেন দুটি রেল লাইন, পাশাপাশি চললেও কখনো একত্রিত হই না, শুধু মাঝে মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

মেয়েটি শ্যামাঙ্গী, মাঝারি গড়ন, মাথা ভর্তি মেঘ কালো চুল, মায়াভরা চোখ ও চোখে যেন কান্নার সাগর লুকিয়ে আছে। মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন। অঙ্গে তারুণ্যের উগ্র লাবণ্য নেই, আছে যৌবনের সৌম্যভাব। পাবনাই তাতের শাড়িতে ওকে অপূর্ব লাগে।

একদিন কলেজ যাচ্ছি। বটতলায় এসে দেখি মেয়েটি এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। ওর পাশে বছর দশেকের একটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে, তার কোলে বছর দুয়েকের একটা শিশু ডুকরে কাদছে আর আমার সহযাত্রিনীর কোলে যাবার জন্য হাত-পা ছুড়ছে। এ অবস্থায় ওকে জোর করে কোলে নিয়ে আট দশ বছরের মেয়েটি মেঠো পথ ধরে চলে গেল।

আমি আমার সহযাত্রিনীর কাছে গেলাম। বেকুবের মতো সরাসরি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি কে?

আমার কথায় মেয়েটি লজ্জা পেল। লজ্জাবনত মুখে শুকনো হাসি হেসে বললো, এ আমার গলার কাটা, আমার পায়ের বেড়ি। আজ মন খারাপ, একদিন আপনাকে সব কথাই বলবো।

সেদিন আর কোনো কথাবার্তা হলো না।

এরপর কলেজে যাওয়া–আসার পথে তার সঙ্গে প্রায়ই টুকটাক কথা হয়। তার নাম জেবুননেসা জবা, ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী।

ভাদুরে রোদ পড়েছে।তাল পাকানো গরম। মাঠ পথ, উঠান, আঙিনায় আউশ ধানের ভ্যাপসা গন্ধ। আমন ক্ষেতের হাটু পানি গরম হয়ে মাছ মরে উঠছে। কলেজে যাচ্ছি। মাথায় নিত্যসঙ্গী ছাতা যে ছাতার কারণে আমার সতীর্থরা আমাকে *জামাইবাবু* বলে।

বটতলায় এসে দেখি জবা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমার কাছে এলো। একটা আকুতি ভরা কণ্ঠে ও আমাকে বললো, বড়ভাই, আমাকে কি আপনার ছাতার নিচে একটু নেবেন?

বললাম, অবশ্যই, তুমি ছাতাটা নাও, আমি...।

না, না, তা হয় না, আপনার ছাতার তলায় একটু...।

ভালো করে খেয়াল করলাম, তার চোখের পাতা ভেজা। তাকে ছাতার নিচে নিলাম। দুজন নীরবে পথ চলছি। একটা মদির সুঘ্রাণে আমি আমোদিত।

এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে তাকে বললাম, তুমি সব সময় মনমরা হয়ে থাকো কেন? ও হ্যা,তোমার সব কথা কিন্তু এখনো বলা হয়নি!

সব মানুষই কোনো প্রকার কার্য–কারণ, বিচার–বিশ্লেষণ ছাড়াই কাউকে না কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। জবাও হয়তো আমাকে তেমনিভাবে বিশ্বাস করেছে। আমার কথার উষ্ণতায় তার বুকে জমে থাকা পাষাণ কঠিন দুঃখের বরফপিণ্ড গলতে শুরু করলো।

সে বিবাহিতা। সেদিন যে মেয়েটা কাদছিল সেটা তারই। স্বামী–শ্বশুর–শাশুড়ি কেউ তাকে দেখতে পারে না। তার অপরাধ, তার প্রথম কন্যা সন্তান হয়েছে। তার শ্বশুরকুলের ধারাক্রমে সে অপয়া। তার পণ্ডিত–মূর্খ স্বামীও এ ধারণা ছাড়তে পারেনি। তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অল্পদিনে ছাড়াছাড়ি হবে।

জবার বেদনার কাহিনী আমার মনে আলোড়ন তুললো। আমাকেও তো মানুষ *অপয়া* বলে। আতুর ঘরে থাকতেই বাবাকে হারিয়েছি। কাচা বয়সে বিধবা আমার মা আমাকে পাচ মাস বয়সের সময় নিঃসন্তান বড়মায়ের কোলে তুলে দিয়ে কার যেন হাত ধরে চলে গেছেন। আমার দিকে আর কখনো ফিরে তাকাননি। বড়মা আমাকে কোলে–পিঠে করে, খেয়ে না খেয়ে মানুষ করেছেন। ভাগ্যিস বড়মা ছিলেন! না হলে আতুর ঘর থেকে বের হয়েই হয়তো কোনো খানা–খন্দকে মরে পড়ে থাকতে হতো।

আমার দিনের শান্তি, রাতের ঘুম হারাম হলো। অবশেষে একদিন আমার মনের সমস্ত দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জবাকে বললাম, তোমার যদি সত্যিই ছাড়াছাড়ি হয় তবে আমি আছি। আমার ওপর ভরসা করতে পারো।

বিষণ্ন জবা রঙে–রসে সতেজ হয়ে উঠলো। কলেজে যাওয়া–আসার পথে, কলেজ চত্বরে রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়, গল্প হয়। তার ফুটফুটে মেয়েটার জন্য চকলেট কিনে দিই।

এবার বিএ পরীক্ষা দেবো, ফরম পূরণ হয়ে গেছে। কলেজে যেতে হয় না। শুধু জবার সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন কলেজে গেলাম। তার দেখা পেলাম। সেই বিষাদ মলিন তার মুখ। আমি বিপদ অনুমান করলাম।

দুজনে বাড়ি ফিরছি, পাশাপাশি হাটছি। বললাম, কি জবা, কথা বলছো না কেন?

হৃদয়ের গহীন থেকে কান্না হয়ে তার কথা বের হলো, বড়ভাই, আমাকে মাফ করবেন, আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো না। সেই নরকপুরীতে আমাকে যেতেই হবে।

জনাকীর্ণ পথ, দুজন নীরবে পাড়ি দিচ্ছি। এ পথ যদি অনন্তকালের হতো! তা তো হবার নয়, কারণ জবা অপয়া, আমিও তাই।

এক সময় পথের ইতি হলো। কষ্টে হেসে বললাম, এ তো খুশির খবর। তুমি ঘর পাবে, তোমার মেয়ে পাবে বাপ। দোয়া করি সুখী হও।

চোখে আচল চেপে জবা চলে গেল।

আমার মনের ঘা শুকাতে বেশ সময় লাগলো, দাগ থেকেই গেল।

তিন বছর পর একদিন রাজাবাজারে তার সঙ্গে দেখা। সেই দুঃখ মলিন মুখ, সেই মায়াভরা চোখ। বললাম, কি জবা, ভালো আছো তো?

সে সোজা-সাপটা বললো, বড়ভাই, ভালো আছি। চিরদিনের জন্য তারা আমাকে মুক্তি দিয়েছে। উপহার স্বরূপ কাখে একটা, আর কোলে আরেকটা মেয়ে তুলে দিয়েছে। একটা প্রাইমারি স্কুলে আমার চাকরি হয়েছে। একটা খুশির খবর শুনলাম, তার একটা চাকরি হয়েছে। তবুও অব্যক্ত বেদনায় আমার মন ভরে গেল। আমি আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমার পাশে দাড়িয়ে আছে আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী সানু।

সপুরা, রাজশাহী থেকে

অন্বেষণ

– সৈয়দ সাঈদ

রঘু! হাত ছাড়! বলে মোহনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। রঘু ও মোহনা শহর ছেড়ে মুন্সিগঞ্জের এক নিরিবিলি গ্রামীণ পরিবেশে বেড়াতে এসেছে। ঢাকা শহরের অসহ্য চিৎকারময় পরিবেশের তাণ্ডবলীলা থেকে বাচতে দুজন দুজনের হাত ধরে মোটামুটি অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ এক অজানা জায়গায় এসে হাজির।

রঘু ও মোহনা একটা গাছের নিচে হেলান দিয়ে বসেছে। রঘুর দিকে মোহনা নিষ্পলক কতোক্ষণ তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা রঘু, তোর আর আমার ভেতর সম্পর্কটা কি?

রঘু যেন একটু চমকে উঠলো। মনোরম এক পরিবেশে এ কি ধরনের প্রশ্ন? সম্পর্ক নিয়ে হঠাৎ এখন এতো ব্যস্ত হওয়ার কি আছে! রঘু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, গাছ ও মাটির ভেতর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক।

মোহনা ভ্রূ কুচকে উত্তর দিল, বুঝলাম না।

রঘু বললো, পাগলি! ভালোবাসার সম্পর্ক। তুই হচ্ছিস মাটি আর আমি হচ্ছি গাছ। তোকে আশ্রয় করে আমি বেড়ে উঠছি।

সেক্ষেত্রে তো আমাদের দুজনেরই হয় গাছ, নাহয় মাটি হওয়া উচিত ছিল। কারণ আমরা দুজনেই তো মানুষ। মোহনা বললো।

রঘু চিৎকার করে বলে, আরে! উদহারণ দেয়ার জন্য বললাম। এই বৃদ্ধ বয়সেও যদি এটা বুঝতে না পারিস তাহলে তোকে নিয়ে তো আমার কপাল খারাপি আছে।

বুঝলাম। মোহনা বললো। কিন্তু বাবাও তো আমাকে ভালোবাসে। আমিও তাকে ভালোবাসি। তাকে আশ্রয় করেই তো আমি বড় হচ্ছি। সেক্ষেত্রে তোর-আমার সম্পর্কটা কি বাপ-মেয়ের সম্পর্কের মতোই না?

মোহনাকে রঘু ভালোভাবেই চেনে। তাই রাগ করে না। সে মোহনার হাত ধরে নরম সুরে বলে, তুই কি খুজছিস বলবি?

রঘুর চোখে গাঢ় করে তাকিয়ে মোহনা বলে, ভালোবাসা।

রঘু আর অপেক্ষা করে না। মোহনার ঠোটে ঠোট রেখে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তা-র-প-র এক সময় সন্ধ্যা হয়।

এরপর রাত হয়।

তবুও মোহনার অন্বেষণ শেষ হয় না।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

হৃদয়ের রানী

– জোবায়ের

একটি মেয়ে যার সঙ্গে আমার পরিচয় শৈশব থেকে, যার সঙ্গে বড় হয়েছি, পার করেছি শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো। মেয়েটির নাম এইচ। আমরা একে অপরকে তুই তোকারি করে ডাকতাম শৈশব থেকেই। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। আমরা পড়তাম একই ক্লাসে। কিন্তু ভিন্ন স্কুলে। থাকতাম পাশাপাশি বাসায়। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।

যাহোক. দিন যেতে যেতে বছরের পর বছর পেরিয়ে আমরা দুজনেই ক্লাস নাইন–এ ভর্তি হই। আমি বয়েজ এবং সে গালর্স স্কুলে। এইচ দেখতে খুবই সুন্দরী আর স্মার্ট ছিল। যেহেতু আমরা ছোট থেকেই একে অপরকে চিনতাম এবং তুই বলে সম্বোধন করতাম সেহেতু একদিন একটি বই তার কাছ থেকে আনার জন্য তাদের বাসায় যাই ও তাকে বলি, তুই তোর ইংরেজি গাইডটি আমাকে দে, আমি দেখে কালকে তোকে দিয়ে যাবো। কিছুক্ষণ পর সে বইটি নিয়ে এসে বলে, তুমি তোমার প্রয়োজন শেষ হলে আমাকে বইটা দিয়ে যেও।

তার কথা শুনে লজ্জায় পড়ে যাই। কেননা সে আমাকে স্বভাবতই তুই সম্বোধন না করে তুমি বলেছে যা অপ্রত্যাশিত। তারপর বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকি। রীতিমতো তাকে দেখলেই আমার হার্ট বিট বাড়তে থাকে। কারণ আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে, সে কেন হঠাৎ করে তুই থেকে তুমিতে গেল? তবে কি সে আমার প্রেমে পড়েছে! তাকে দেখে আমরা তেমন মনে হয় না।

এরপর আমিও তাকে তুমি বলে সম্বোধন করা শুরু করি। তার তুমি সম্বোধনের পর থেকে এইচের প্রতি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি। এটা বুঝতে পারি যতোই দিন যেতে থাকে।

কিছুদিন পর রোজা আসে এবং শেষ হয়ে চলে আসে ঈদ। ঈদের সকালে আমি ঈদের শুভেচ্ছা পাই এইচের কাছ থেকে। এর আগের ঈদগুলোতে তার কাছ থেকে ঈদ শুভেচ্ছা পাইনি। এই অপ্রত্যাশিত ঈদ শুভেচ্ছা পেয়ে আমি হতবাক হয়ে যাই এবং এর দুই অথবা তিন মিনিট পর তাকে আমি *ঈদ মোবারক* জানাই।

এই ঈদের দিনটি আমার জন্য সকল ঈদ থেকে অন্য রকম কাটে। কেননা তার ঈদ শুভেচ্ছা আমাকে মনে করিয়ে দেয় সেই প্রথম প্রশ্নগুলো। আমার মনে হয় আসলে আমি যা ভাবছি তাই সত্যি। কিন্তু মনে তেমন সাহস পাই না। ফলে তাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলিনি।

যাহোক, এই ঈদটি কাটলো এভাবে। এরপরের ঈদেও যথারীতি ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম আমরা। প্রতি ঈদে তারা দুপুরে আর আমরা রাতে একে অপরের বাসায় খেতাম। এই ঈদের রাতে আমাদের বাসায় শুধু আমি একা ছিলাম। কেননা বাসার অন্যরা নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। আন্টি (এইচের মা) আমাকে রাতে তাদের বাসায় খেতে বললেন।

আমি যথাসময়ে গেলাম। তার বাবাসহ আমরা সকলে খেতে বসি। খাওয়ার মাঝে সে তার মাকে আমার পছন্দসই খাবারের বর্ণনা দেয়। এ সময় সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

এতে আমি আরেক দফা ধাক্কা খাই। কিন্তু সে কিভাবে আমার পছন্দের খাবারের কথা জানলো? এর রহস্য এখনো আমার অজানা। এতে করে আমার মনে হতে থাকে যে, সে আসলেই আমার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু আমি যে এই দর্শনে বিশ্বাসী, *মেয়েদের মন বোঝা বড়ই কঠিন*। তাই এবারও সাহস হলো না আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার কথাটি তাকে খুলে বলার।

এরপর যতোগুলো ঈদ আমরা এক সঙ্গে পার করেছি সবগুলোতেই আমরা এক অপরকে ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়েছি। কিন্তু কেউ কাউকে মনের কথা বলিনি।

এক সময় আমি এসএসসি শেষ করে কলেজে ভর্তি হই এবং তারাও বাসা পরিবর্তন করে ফেলে। ফলে একে অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। বলা হয়নি ভালোবাসি কথাটি। আর

ভবিষ্যতে দেখা হলেও বলা হবে কি না জানি না। এইচ আমাকে ভালোবাসতে পেরেছিল কিনা জানি না। তবে আমি সত্যিই তাকে ভালোবেসেছিলাম। তাই তো আমার জীবনের স্মৃতিতে এইচ নামের মেয়েটি হয়ে থাকবে চিরদিনই *হৃদয়ের রানী* যদিও তাকে আমার জীবনের পথ চলাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও তার রেখে যাওয়া ঈদের স্মৃতিগুলো কখনো ভুলতে পারবো না। আমি এখনো কাউকে তার মতো ভালোবাসতে পারিনি, বলতে পারিনি ঈদ মোবারক।

গাজীপুর থেকে

ইমানী মউত

– সৈয়দ শাফায়েত আলী

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদী স্রোতে কেউ ফেরে ঘরে কেউ আসে ঘর থেকে। যাওয়া–আসার এই গভীর দর্শন ব্যাপকভাবে দেখা যায় রবীন্দ্র সাহিত্যে। আসলে যাওয়া–আসার খেলাতেই যেন মেতে আছে নিখিল বিশ্ব। দিন যায়, দিন আসে। বছর যায়, বছর আসে। ঈদ যায়, ঈদ আসে। পৃথিবী থেকে মানুষ যায় আবার মানুষ আসেও।

এ রকম একজন মানুষকে নিজ চোখে সেদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে দেখলাম। আমার স্মৃতিপটে তার এই চলে যাওয়ার দৃশ্য আকা থাকবে চিরদিন।

২০০১ সালের ৮ ডিসেম্বর। রমজান মাসের ২২ তারিখ রাতে। যথারীতি তারাবির নামাজ পড়তে মহল্লার মসজিদে গেছি। রাত পৌনে আটটায় এশার নামাজ শুরু হয়। আটটায় তারাবির নামাজ। সাড়ে সাতটার মধ্যেই মসজিদে যাই। হাটুর ব্যথার কারণে আমাকে বসে নামাজ পড়তে হয়। প্রথম কাতারের একেবারে ডান পাশে জানালার ধারে বসে নামাজ পড়ি।

আমাদের মহল্লারই একজন মুসল্লি যার নাম আমি তখনো জানতাম না। পরে জেনেছি। কখনো আমার আগে, কখনো বা আমার কিছু পরে আসতেন। আমার আগে আসেন বা পরে, অত্যন্ত মিষ্ট হাসি মাখা মুখে তিনি আগে আমাকে সালাম দিতেন। শুধু মসজিদেই নয়, মসজিদের বাইরে দেখা দেখা হলেও তিনি আগে আমাকে সালাম দিতেন। আমি চেষ্টা করেও তাকে কখনো আগে সালাম দিতে পারিনি। সে অবকাশ তিনি আমাকে কখনোই দেননি। বয়স পঞ্চাশঊর্ধ। তিনি সব সময় দ্বিতীয় কাতারে ঠিক আমার পেছনে দাড়িয়ে নামাজ পড়তেন। মনে মনে ভাবতাম কে এই ভদ্রলোক! এমনভাবে সালাম দেন যেন আমি তার সুপরিচিত।

পরে জেনেছি তার নাম খোরশেদ আলী। সরকারি চাকরি করেন। দুই পুত্রের জনক। অত্যন্ত অমায়িক ও শান্ত স্বভাবের মানুষ। আমাদের শ্রদ্ধেয় মজনুভাইয়ের ছোট বোন খেলাআপার স্বামী। তার ছেলে দুটি যেন হীরার টুকরো। মজনুভাই নিয়মিত মসজিদে আসেন। তার সঙ্গে আমার ভালোই সখ্যতা। হয়তো সেই কারণেই তিনি আমার প্রতি ছিলেন এতোটা শ্রদ্ধাশীল।

যাহোক, সেদিন অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর ২০০১, ২২ রমজানের দিনগত রাতে মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে না বসে দ্বিতীয় কাতারে একেবারে ডানপাশে বসলাম। কারণ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব তখন প্রথম কাতারে, আমি যেখানে বসি সেখানে বসে একটা কিতাব হাতে কিছু পড়ছেন। এশার নামাজ শুরু হলে তিনি উঠে তার নির্ধারিত স্থানে গেলে তখন প্রথম কাতারে চলে যাবো।

এশার নামাজ শুরু হতে তখনো মিনিট দশেক বাকি। খোরশেদ আলী এসে আমার পাশে বসেই আমাকে সালাম জানালেন। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। হাসিমুখে আমিও তার সালামের জবাব দিলাম। তারপর তিনি উঠে দাড়ালেন সুন্নত নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে। আমি চুপ করে বসে রইলাম। বুঝতে পারছি তার দুই রাকাত নামাজ পড়া হলো। আত্তাহিয়াতু পড়ার পর পরবর্তী দুই রাকাত পড়ার জন্য উঠে দাড়ালেন। আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছি।

যদিও শীত শুরু হয়ে গেছে তবুও মসজিদের ভেতর মুসল্লি বেশি হওয়ার কারণে কয়েকটি সিলিং ফ্যান চালিয়ে রাখা হতো। হঠাৎ কানে এলো দুম করে কিছু একটা পতনের শব্দ। সকলেই চমকে উঠলাম। ভাবলাম কোনো সিলিং ফ্যান হয়তো খুলে পড়েছে। তাকিয়ে দেখি আমার পাশে নামাজরত খোরশেদ আলী সম্পূর্ণ চিৎ অবস্থায় দুহাত দুই পা ছড়িয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছেন। একেবারে অচেতন। চারদিকে হই চই শুরু হয়ে গেল। মজনুভাই ছুটে এলেন। ছুটে এলো তার দুই ছেলে যারা সব সময় তাদের পিতার সঙ্গে তারাবির নামাজ পড়তো।

মসজিদ সংলগ্ন একটি বাসায় থাকেন একজন ডাক্তার। সকলে মিলে তাকে ধরাধরি করে সেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা কয়েকজন যখন তাকে ধরে ওঠাচ্ছি তখন তার ভেতরে গো করে একটা অদ্ভুত রকমের দীর্ঘ শব্দ হলো। তারপর সব চুপ। ডাক্তার তাকে দেখে কিছু না বলে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কয়েকজন তাকে নিয়ে হাসপাতাল চলে যাওয়ার পর ডাক্তার যেটা বললেন, হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকও ঠিক সেই কথাই বলেছিলেন।

খোরশেদ আলী আর নেই। তিনি তারাবির নামাজ পড়তে আসবেন না। তিনি ঈদের জামাতে যাবেন না। তিনি মিষ্টি হাসি হেসে আমাকে সালাম জানাবেন না। সেই দীর্ঘ গো শব্দটাই বোধহয় ছিল তার শেষ নিঃশ্বাস। অনেক রকমের মৃত্যুর কথা শুনেছি। অনেক মৃত্য ব্যক্তি দেখেছি। কিন্তু চোখের সামনে নামাজ পড়া অবস্থায় এভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে কাউকে দেখিনি। আমাদের মসজিদের ইমাম একে *ইমানী মউত* বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ঈদের মাত্র আট দিন আগে খোরশেদ আলীর এই মহাপ্রয়াণে পরবর্তীকালে তার রেখে যাওয়া পরিবারের মানসিক অবস্থা কি হতে পারে এটা শুধু অনুমান বা উপলব্ধির বিষয়, বর্ণনার নয়।

রোজা আসবে, ঈদ আসবে। রোজা যাবে, ঈদ যাবে। মহাপ্রলয় পর্যন্ত চলতে থাকবে যাওয়া– আসার এই লীলাখেলা। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হয়তো আরো তারাবির নামাজ পড়বো, পড়বো ঈদের নামাজ। কিন্তু সেই মিষ্টি হাসি মাখা মুখ খোরশেদ আলীকে আর কোনোদিন পাবো না, পাবো না তার সশ্রদ্ধ সালাম।

খোরশেদ আলী, আপনার বিদেহী আত্মা অনন্ত শান্তি লাভ করুক এই কামনা করি।

উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে